শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

উৎসর্গ

অগ্রজ কথাশিল্পী, স্নেহময় সুরসিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

ভাগলপুর
৪।৩।৫৯

বনফুল

ভূমিকা

'অগ্নীশ্বর' গল্পটি খণ্ডিত ভাবে গত পূজাসংখ্যা 'বেতার জগতে' বাহির হইয়াছিল। সম্পূর্ণ গল্পটি এই গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হইল।

এই গল্পে যেখানে কথোপকথন ইংরেজিতে হইয়াছে সেখানে আমি অনেক জায়গায় ইচ্ছা করিয়াই শুদ্ধ বাংলা ব্যবহার করিয়াছি। ইহা ইচ্ছাকৃত 'গুরু-চণ্ডালী'।

ভাগলপুর
৪।৩।৫৯

বনফুল

ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায় সার্থকনামা ব্যক্তি। জানি না এখন তাঁহার চেহারা কেমন আছে, কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্বে তিনি দেখিতে মূর্তিমান অগ্নিশিখার মতোই ছিলেন, যেমন উজ্জ্বল তেমনি প্রখর। কিন্তু অগ্নির সহিত তাঁহার সাদৃশ্য ওইখানেই শেষ হইয়াছে। তাঁহার বাহিরের খোলসটার অন্তরালে, তাঁহার মর্মভেদী ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ তীব্রতার নেপথ্যে যে স্নেহাতুব আদর্শবাদী ন্যায়পরায়ণ পরার্থপর সত্তাটি ছিল লেলিহান অগ্নিশিখার তাহা থাকে না। তাঁহার এই সত্তাটি কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই নয়নগোচর হইত না। তিনি যখন কাহারও হৃদয় বা মস্তক লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিতেন, তখন সে বেচারীর মনে রাগ ছাড়া অন্য কোন ভাবোদ্রেক হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত না। তিনি অন্য ভাবোদ্রেক করিতে চাহিতেনও না। লোকে যেমন মশা, ছার-কা, সাপ ব্যাঙকে ঘর হইতে তাড়ায়, তিনি তেমনি অধিকাংশ লোককে নিজের সান্নিধ্য হইতে বিতাড়িত করিতেন। কোন প্রকার বোকামি, গোঁড়ামি, ভণ্ডামি, ন্যাকামি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রায়ই বলিতেন—বাইবেলে পড়েছি মানুষের মুখে একটা ডিভাইন লুক (Divine look) আছে, কিন্তু আমি তো বোভাইন লুক (Bovine look) ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাই না। তার সঙ্গে পেজোমিরও মিশেল আছে। সব বোকা বদমাইসের দল।

এঁর সঙ্গে আমার প্রথম সংস্পর্শ ছাত্র-জীবনে। ইনি তখন ছিলেন রেলের মেডিকেল অফিসার। সে যুগে গভর্ণমেন্ট অফিসারই রেলের মেডিকেল অফিসাররূপে কাজ করিতেন।

অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায় কাজে যোগদান করিয়াই এমন একটা

কাণ্ড করিলেন যে রেলের বাবুদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। তিনি আসিয়াই শুনিলেন যে, তাঁহার পূর্ববর্তী মেডিকেল অফিসার অন্নদা ঘোষালের সহিত রেলের বাবুরা নাকি বড়ই দুর্ব্যবহার করিয়াছেন। ডাক্তার ঘোষাল ভালো মানুষ লোক ছিলেন, সকলকে বিনাপয়সায় দেখিতেন, বিনাপয়সায় সার্টিফিকেটও দিতেন। যে যখন ডাকিত তখনই ছুটিতেন। কিন্তু সাধারণত যাহা হয় তাহাই হইল। সকলকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত তিনি সকলকেই অসন্তুষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার নামে ওপরওলার কাছে দরখাস্ত গেল, তিনি যে মিথ্যা সার্টিফিকেট দেন তাহাও প্রমাণিত হইল। ডাক্তার ঘোষাল হতমান হইয়া বদলি হইয়া গেলেন। তাঁহার সার্ভিস-রেকর্ডে কলঙ্কের ছাপ পড়িল। অগ্নীশ্বর যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র, ডাক্তার ঘোষাল তখন সেখানে হাউস-সার্জন ছিলেন। তাই তাঁহাকে তিনি মাস্টার মশাই বলিয়া ডাকিতেন এবং তাঁহার উদার স্বভাবের জন্য ভক্তিও করিতেন। চার্জ লইবার সময় ডাক্তার ঘোষালের মুখে অগ্নীশ্বর সমস্ত শুনিলেন এবং তাহার চোখে জল দেখিয়া বিচলিতও হইলেন। ঘোষাল ধরা-গলায় বলিয়া গেলেন, "বিশ্বাস কর, ওদের ভালর জন্যেই এসব করেছিলাম আমি। ওরা শেষটা যে আমাকে এমন দাগা দেবে, তা আমি ভাবতে পারিনি।"

পরদিন সকালে অগ্নীশ্বর আপিসে গিয়া দেখিলেন যে, একটি স্থূলকায়, বেঁটে কালো লোক একটি চেয়ারে গদিয়ান হইয়া বসিয়া আছে।

"নমস্কার, আপনিই নতুন ডাক্তারবাবু নাকি—"

"হ্যাঁ। আপনি কে—"

"আমার নাম সর্বেশ্বর সান্যাল। আমি এখানকার ডি, টি, এস আফিসের বড়বাবু—"

"আমার সঙ্গে কি দরকার আপনার—"

"আজ তিনদিন থেকে আমার ছোট্ট মেয়েটার হুপিং কাশি হয়েছে—"

"আপনি এখানে কেন। বাইরে বারান্দায় ওই কাঠের রেলিংটার ওপারে গিয়ে দাঁড়ান। তারপর ডাক্তার লতিফ আপনার মেয়ের কথা শুনে ওষুধের ব্যবস্থা করে দেবেন। এখানে রোগীদের বসবার জায়গা নয়, বাইরে যান—"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে এমন একটা দৃঢ়তা ধ্বনিত হইল যে সর্বেশ্বরবাবু উঠিয়া পড়িলেন।

"আমরা এখানেই তো বরাবর বসে এসেছি।"

"আর বসতে পাবেন না।"

"কারণটা জানতে পারি কি—"

"কারণ আপনি চেরিটেব্‌ল হাসপাতালে ওষুধ ভিক্ষে করতে এসেছেন। ভিকিরিদের কেউ চেয়ারে বসতে দেয় না। বসতে দেবার নিয়ম নেই। ওই দেখুন, লেবেল লটকানো রয়েছে—ফর আউটডোর পেশেণ্টস—ওইখানে যান—"

"আপনি কোন প্রেসক্রিপশেন দেবেন না?"

"এখন দেব না। ডাক্তার লতিফের ওষুধে যদি না সারে আর তিনি যদি আমাকে দেখতে বলেন তখন দেখব, তার আগে নয়।"

অগ্নীশ্বর টং করিয়া টেবিলের ঘণ্টা বাজাইলেন। চাপরাশি প্রবেশ করিল।

"বাবুকে আউটডোরে নিয়ে যাও। আমার বিনা হুকুমে এখানে কাউকে ঢুকতে দেবে না। যদি দাও, চাকরি যাবে।"

চাকরির প্রথম দিনেই তিনি যে চাবুক হাঁকড়াইলেন, তাহা সেখানকার রেলওয়ে কলোনীর সকলের পিঠে জ্বালা ধরাইয়া দিল। কিন্তু তিনি চাবুক সম্বরণ করিলেন না, সপাসপ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটিল সেইদিনই সন্ধ্যায়।

"ডাক্তারবাবু, আমার ছেলেটার সাতদিন থেকে জ্বর ছাড়ছে না, যদি—"

"আজ তো হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গেছে। কাল সকাল আটটায় ডাক্তার লতিফের কাছে যাবেন—"

"আমি আপনাকে 'কল' দিতে এসেছি।"

"আমি ষোল টাকার কম ফি নিই না, সেটা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। আর টাকাটা অগ্রিম জমা করতে হবে—"

ভদ্রলোক বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে অগ্নীশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অগ্নীশ্বর অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমি অন্নদা ঘোষাল নই, আমি অগ্নীশ্বর মুকুজ্যে। আমার নিয়মকানুন অন্য রকম—"

ভদ্রলোকটি সহসা বলিয়া ফেলিলেন, "আপনি ডাক্তার, না পিশাচ—"

"পিশাচ"।

"বেশ, এই নিন ষোল টাকা। চলুন—"

অগ্নীশ্বর তাহার বাসায় গেলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া ছেলেটিকে পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর একটি প্রেসক্রিপশন লিখিয়া চলিয়া আসিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে সেই ভদ্রলোকটি ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "আপনি রুগীর বিছানায় আপনার ফি'টা ফেলে এসেছেন সার।"

"না, আমি ফেলে আসিনি। ও আর কেউ ফেলে গেছে বোধহয়—"

ভদ্রলোক বিস্মিত হইয়া চলিয়া গেলেন। যে জ্বর সাতদিনে ছাড়ে নাই, তাহা তাহার পর দিনই ছাড়িয়া গেল।

তৃতীয় চাবুকটি পড়িল বীরু মিত্তিরের পিঠে। তিনিও অগ্নীশ্বরকে কল দিয়াছিলেন স্ত্রীর জ্বরের জন্য। অগ্নীশ্বর তাঁহাকে একটি প্রেসক্রিপশন লিখিয়া দিলেন, কুইনিন মিকশ্চার। ছয় দাগ। তিন দাগ খাইয়াই জ্বর ছাড়িয়া গেল। হোমিওপ্যাথীতে বিশ্বাসী বীরু মিত্তির আবার অগ্নীশ্বরের কাছে গেলেন।

"সার, তিন দাগ খেয়েই জ্বরটা ছেড়ে গেছে। বাকী তিন দাগ খাওয়াব কি? শুনেছি কুইনিন ওষুধটা একটু তীব্র—"

অগ্নীশ্বর একটা বই পড়িতেছিলেন। বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "আপনার গালে যদি ঠাস ঠাস করে ছ'টা চড় মারা দরকার হয় তিন চড়ে শানাবে কি? ছ'টা চড়ই মারতে হবে। তিন দাগ ওষুধে হলে আমি ছ'দাগ দিয়েছি কেন—"

অগ্নীশ্বর চোখ পাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, বীরু মিত্তির অবিলম্বে সরিয়া পড়িলেন।

চতুর্থ যে ঘটনাটি পল্লবিত হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল সেটি ঘটিয়াছিল প্রায় মাসখানেক পরে।

স্থানীয় রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার যোগেশ রক্ষিত রেলওয়ে কোম্পানীতে একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি। গোঁফ-জোড়া বেশ পুষ্ট, বুকের ছাতি বেশ চওড়া, হাত-পায়ের পেশীগুলি বেশ সমৃদ্ধ। চোখ দুটি বেশ বড় বড় এবং লাল। দেহের বর্ণ মসীনিন্দিত। তাঁহার গর্ব যে তিনি যার-তার সহিত মেশেন না। আলাপ করিবার মতো লোকই নাই শহরে, এই তাঁহার ধারণা। মাঝে মাঝে ফিরিঙ্গি ডি, টি, এস মিস্টার স্কটের বাড়িতেই যান, যখন সময় পান। ডাক্তার অন্নদা ঘোষালকে তিনি মানুষের মধ্যেই গণ্য করিতেন না। বলিতেন, উনি হচ্ছেন কাদার গোঁজ। যে দিকে টান সেই দিকেই হেলিয়া থাকিবে। যদিও অগ্নীশ্বরের কড়া ব্যবহারে সকলে প্রথমটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু

অগ্নীশ্বর নিজের ব্যক্তিত্ব, চিকিৎসা-নৈপুণ্য এবং চরিত্রের জোরে সকলের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, মাখনের তালের ভিতর ছুরির মতো। তাঁহাকে অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। তিনি কড়া লোক সন্দেহ নাই, কিন্তু ডাক্তারও অসম্ভব রকম ভাল। তাছাড়া, কিছুদিনের মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িল তিনি লেখকও। ছবিও আঁকিতে পারেন। ছদ্মনামে সে-সব লেখা আর ছবি ছাপাও হয়। কিছুদিনের মধ্যেই আশঙ্কা-সম্মান-কৌতূহল-মিশ্রিত একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন তিনি নিজের চারিদিকে। তিনি কখনও কাহারও বাড়িতে যাইতেন না। অবসর সময়ে নিজের ড্রইংরুমের ইজিচেয়ারে বসিয়া থাকিতেন, আর পা দোলাইতেন, মুখে চুরুট, হাতে বই।

ইঞ্জিনিয়ার যোগেশ রক্ষিত একদিন স্থির করিলেন, তিনি অগ্নীশ্বর ডাক্তারের উপর অনুগ্রহ করিবেন, অর্থাৎ তাঁহার বাড়ি গিয়া তাঁহার সহিত গল্প করিয়া আপ্যায়িত করিবেন তাঁহাকে। গেলেন একদিন। অগ্নীশ্বরের সহিত তাঁহার সাধারণ ভাবে আলাপ ছিল, একজন অফিসারের সঙ্গে আর একজন অফিসারের যেমন থাকে।

"গুড মর্নিং ডাক্তারবাবু, কেমন আছেন—"

"প্রবলভাবে ভাল আছি। 'ঘরে-বাইরে' পড়ে শেষ করলুম একটু আগে—"

"ঘরে-বাইরে'? সেটা আবার কি!"

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেছেন?"

"হ্যাঁ, ওই যিনি বোলপুরে শান্তিনিকেতন করেছেন তিনিই তো—"

"হ্যাঁ, তিনি বইও লেখেন।"

"ও"

ইহার পর রক্ষিত মহাশয় যে-সব গল্প ফাঁদিলেন তাহা ইঞ্জিনিয়ারিং গল্প এবং সমস্ত গল্পগুলির মধ্যে তাঁহার 'আমিত্ব' কলকল-নিনাদে আত্মজাহির করিতে লাগিল। তিনি কোথায় কোথায় ব্রিজ ডিজাইন করিয়াছেন, কোন কোন বিলাতী-ডিগ্রীধারী ইঞ্জিনিয়ারকে 'থ' করিয়া দিয়াছেন, তিনি না থাকিলে রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট কিভাবে অচল হইয়া যাইত—এইসব গল্প।

হঠাৎ অগ্নীশ্বর বলিলেন, "দেখুন দেখুন, কেমন একটা অদ্ভুত পাখী। ল্যাজটা ঠিক সাপের মতো—"

"কই—"

"ওই যে তেঁতুলগাছের ডালটায় বসে আছে।"

রক্ষিত মহাশয় ভালো করিয়া দেখিবার জন্য জানলার ধারে গেলেন এবং ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিলেন।

"কই মশায়, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।"

"পাবেন না, চলে আসুন।"

"পাব না কেন। দেখি দাঁড়ান, কোন ডালটায়—"

"ওরকম পাখী নেই ওখানে। চলে আসুন। আমি আপনার বাক্যস্রোতে 'ড্যাম' দিয়ে দিলুম একটা। কথার তোড়ে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আসুন, চা খান—"

বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম আনিয়াছিল। অগ্নীশ্বর নিজেই চা ঢালিয়া দিতে লাগিলেন।

গল্প আর জমিল না।

"আজ উঠি। টেবিলের উপর ও বইটা কি?"

"ঘরে-বাইরে"

"ও, সেই যেটার কথা বলছিলেন। নিয়ে যেতে পারি কি?"

"যান"

"আপনার নানারকম বইটই কেনার বাতিক আছে, না?"

"তা আছে। আপনাদের মতো লোকের সঙ্গ তো জোটে না বড় একটা। বইটই নিয়েই থাকি।"

রক্ষিত মহাশয় দুই দিন পরেই 'ঘরে-বাইরে'খানি হাতে লইয়া আবার দেখা দিলেন।

"কি একটা বাজে বই দিয়েছেন মশাই। যাকে বলে ইম্মরাল, এ একেবারে তাই। আমাদের ঝক্‌সু সর্দার কিছুদিন আগে একটা কুলির বউকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিল, এ যে দেখছি সেই গল্পই। আরে ছি ছি ছি। একটা ভালো বই দিন এবার।"

"ভালো বই? ভেবে দেখি দাঁড়ান, ভালো বই কি আছে আমার? ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে একখানা—"

অগ্নীশ্বর ভিতরে ঢুকিয়া গেলেন এবং একটা মোটা পাঁজি বাহির করিয়া আনিলেন।

"এইটে নিয়ে যান, অনেক ভালো ভালো কথা আছে এতে, ভালো লাগবে আপনার—"

যোগেশ রক্ষিতের চক্ষুস্থির হইয়া গেল।

"আমাকে ঠাট্টা করছেন?"

"পাগল! অতটা বেরসিক আমি নই। হিজড়ের সঙ্গে প্রেম করা যায় নাকি!"

অগ্নীশ্বর আর বাক্যব্যয় না করিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। সেইদিন হইতে যোগেশ রক্ষিতও তাঁহার শত্রু হইয়া গেল। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইত তাঁহাকে। বাড়িতে আসন্নপ্রসবা কন্যা, স্ত্রীর হাঁপানি, নিজেরও হাই ব্লাডপ্রেসার, অগ্নীশ্বরকে তিনি পুরাপুরি বয়কট করিতে পারিলেন না। আর যাই হোক, লোকটা ডাক্তার ভালো। তাঁহার কচি মেয়েটা কাসিয়া কাসিয়া সারা হইতেছিল, শহরের কত ডাক্তারের কত ওষুধই খাওয়ানো হইল, কিছুতেই কিছু হয় নাই।

অগ্নীশ্বরকে ডাকা হইল, তিনি বলিলেন, "নাকে একটু করে তেল বা লিকুইড্ প্যারাফিন দিন তাহলেই সেরে যাবে। কোন ওষুধ খাওয়াতে হবে না।"

তাই করা হইল এবং মেয়েটা সারিয়া গেল। সুতরাং অগ্নীশ্বরের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে ঝগড়া তিনি করিতে পারিলেন না। কিন্তু হৃদ্যতাটা আর রহিল না। অগ্নীশ্বর কাহারও সহিত হৃদ্যতা করিতে চাহিতেনও না।

পঞ্চম যে ঘটনাটি ঘটিল তাহা আরও চাঞ্চল্যজনক। সাহেব-মহল পর্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল।

ডি-টি-এস মিস্টার স্কটের স্ত্রী আসন্নপ্রসবা। অগ্নীশ্বর একদিন গিয়া তাঁহাকে যথাবিধি পরীক্ষা করিয়া উপদেশ প্রভৃতি দিয়া আসিয়াছিলেন।

দিন দুই পরে এক বেয়ারা সাহেবের এক চিঠি লইয়া আসিল।

Doctor, come immediately. My wife is not feeling well.

একটা প্লীজ পর্যন্ত লেখে নাই লোকটা।

অগ্নীশ্বর গেলেন না। তাঁহার অধীনে আবদুল লতিফ নামে যে সাব-এসিস্টেন্ট সার্জন ছিলেন তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি গিয়ে দেখে আসুন ব্যাপারটা কি। যদি দরকার হয় আমি যাব। যে অ্যাপেন্‌ডি-সাইটিস কেসটা রেডি করতে বলেছিলাম সেটা রেডি হয়েছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"ওটা এখুনি অপারেশন করব। সব ঠিক করতে বলুন। আর আপনি গিয়ে চট করে দেখে আসুন মিসেস স্কটের কি হয়েছে—"

ডাক্তার আবদুল লতিফ প্রবীণ ব্যক্তি, সেকেলে মুসলমান। লম্বা দাড়ি, চুস্ত পাজামা-আচকান-পরা, মাথায় লাল রঙের

টিকিওলা মুসলমানী টুপি। পান জরদা খান, দাঁতগুলি কালো। অতিশয় সজ্জন।

তিনি অগ্নীশ্বরের আদেশ শুনিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "হুজুর, আমাকে উনি ডাকেননি, আপনাকে ডেকেছেন। সাহেবটা একটু বাঘা গোছের। আমি গেলে কিছু বলবে না তো—"

"যদি বলে তখন ব্যবস্থা করা যাবে। আপনি গিয়ে বলুন, আমি একটা অপারেশন করছি, এখন যাবার উপায় নেই। তেমন সিরিয়াস যদি কিছু হয়ে থাকে, যাব—"

আধঘণ্টা পরে আবদুল লতিফ ফিরিয়া আসিলেন। মুখ থমথম করিতেছে।

"আমাকে যাচ্ছেতাই অপমান করে তাড়িয়ে দিলে হুজুর। এমন অপমানিত আমি জীবনে হইনি। আমি আগেই আপনাকে বলেছিলাম—"

আবদুল লতিফের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।

"I am extremely sorry, Dr. Latif. লোকটা যে এরকম বর্বর তা আন্দাজ করতে পারিনি। আমাকে ক্ষমা করুন।"

ডাক্তার লতিফের দুই হাত ধরিয়া তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

একটু পরেই মিস্টার স্কটের নিকট হইতে আর একটি পত্র আসিল। চিঠির সুরটি একটু গরম। চিঠির বাংলা মর্ম এই—

"আমি চাই তুমি আসিয়া আমার স্ত্রীকে দেখ। ওই জরদ্গব লতিফকে দেখাইবার ইচ্ছা নাই। তুমি অবিলম্বে চলিয়া এস।"

অগ্নীশ্বর উত্তর দিলেন।

"সরি, আমার এখন যাইবার উপায় নাই। একটি অপারেশন লইয়া ব্যস্ত আছি। যদি আমার দেখা নিতান্তই প্রয়োজন মনে করেন, মিসেস স্কটকে এখানেই পাঠাইয়া দিবেন। আমি একটি নার্স, চারটি বেয়ারা এবং একটি স্ট্রেচার পাঠাইয়া দিতেছি।"

বলা বাহুল্য, মিসেস স্কট স্ট্রেচারবাহিত হইয়া আসিলেন না। তাঁহার পেটের একধারটা সামান্য কুন্ কুন্ করিতেছিল মাত্র। স্ট্রেচার যখন গেল তখন তাহাও কমিয়া গিয়াছিল।

ডি-টি-এস কিন্তু চটিয়া আগুন হইয়া রহিলেন। একটা নেটিভ ডাক্তার, তা হউন না তিনি মেডিকেল অফিসার, তাঁহার এতবড় স্পর্ধা! হাসপাতাল কমিটির তিনি একজন সদস্য ছিলেন। একটি মিটিংয়ে তিনি অগ্নীশ্বরকে বলিলেন, "দেখ ডাক্তার, তোমার বিরুদ্ধে অনেক নালিশ শুনিতেছি। এমন কি, আমার সহিতও তুমি যে ব্যবহার করিয়াছ তাহা ভদ্রজনোচিত নহে, তুমি যদি—"

অগ্নীশ্বর তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, "আপনারা সুসভ্য জাতির প্রতিভূ। আপনাদের ব্যবহার, পোশাক, ভাষা সব আমরা নকল করি। সেদিন আপনি আপনার পিতার বয়সী ডাক্তার লতিফের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা কি ভদ্রজনোচিত ?"

বলিয়াই অগ্নীশ্বর উঠিয়া যাইতেছিলেন, সাহেব বলিলেন, "দেখ ডাক্তার মুখার্জি, আমিই এই রেলওয়ে কোম্পানীর দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা, আমি যদি ইচ্ছা করি, তোমাকে খুব বিপদে ফেলিতে পারি, একথাটা ভুলিও না।"

"না, ভুলিব না, আমার স্মৃতিশক্তি খুব খারাপ নয়।"

সাতদিন পরেই এক বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিল। ওই জংশনটি হইতে প্রত্যহ কুড়িটি গাড়ি ছাড়িত। একদিন দেখা গেল, একটি গাড়িও ছাড়িবার আশা নাই। অগ্নীশ্বর সমস্ত ড্রাইভারগুলিকে সিক্ সার্টিফিকেট দিয়াছেন। একটিও বাড়তি ড্রাইভার নাই। ডি-টি-এস আপিসেও এত অধিকসংখ্যক কেরানী সহসা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে যে আপিস বন্ধ হইবার উপক্রম।

মিস্টার স্কট অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের নিকট ছুটিয়া আসিলেন।

"এ কি কাণ্ড ডাক্তার মুখার্জি। এতগুলি লোক একসঙ্গে 'সিক্' হইল কি করিয়া?"

"চট করিয়া তো ইহার জবাব দিতে পারি না, বইটই ঘাঁটিয়া দেখিতে হইবে। তবে এদেশে ম্যালেরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা এইরূপ ঝাঁকে ঝাঁকেই হয়। গোটা দুই অ্যাপেনডিক্স্, গোটা ছয়েক হেপাটাইটিস, কয়েকটা প্লুরিসিও আছে—"

"উহারা কি কাজ করিতে অক্ষম—?"

"আমাদের শাস্ত্রানুসারে উহাদের শুইয়া থাকা উচিত। কিন্তু আপনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, আপনি হুকুম করিলে হয়তো উহারা কাজে যোগ দিবে। তবে যদি কেহ মরিয়া যায় তাহার দায়িত্ব আপনার, আমার নয়। কারণ, আমার মতে উহাদের এখন শুইয়া থাকা উচিত, আমি এখন উহাদের একজনকেও ফিট্ সার্টিফিকেট দিব না।"

মিস্টার স্কট অনন্যোপায় হইয়া অগ্নীশ্বরের চাকরির যিনি হর্তা-কর্তা-বিধাতা সেই আই-জি'কে টেলিগ্রাম করিলেন। আই-জি আসিয়া অগ্নীশ্বরকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হ্যালো, আগ্নি, তুমি এখানে। হোয়াট্স দি রাউ অ্যাবাউট?"

অগ্নীশ্বর যখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন, এই আই-জি ছিলেন সেখানকার অধ্যাপক। প্রায় সব বিষয়ে স্বর্ণ-পদক-প্রাপ্ত অগ্নীশ্বরকে সেকালের কোন অধ্যাপকই ভোলেন নাই। এই আই-জি তো তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "ব্যাপার কি!"

"ব্যাপার কিছুই নয়। আমি যাদের সিক্ মনে করেছি, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে হাসপাতালে ভর্তি করেছি। এর জন্যেই আমি মাইনে পাই। রেলগাড়ি চলবে কি না, ডি-টি-এস আপিস চলবে কি না, দ্যাট্ ইজ্ নট্ মাই কনসার্ন, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা নয় আমার—!"

আই-জি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শুনিতেছিলেন, তাঁহার দৃষ্টি হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। অগ্নীশ্বরকে তিনি চিনিতেন।

"ত সব তো শুনেছি, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি—"

অগ্নীশ্বর এবার হাসিয়া ফেলিলেন "সেটা তো সার কথায় বলা যাবে না। এই রেলওয়ে কলোনীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তার ভদ্রতা-জ্ঞানের সমালোচনা আমার মুখে মানাবেও না।"

"কি হয়েছে বল না। স্পীক্ দি টথ—"

তখন অগ্নীশ্বর তাঁহাকে আগাগোড়া সব বলিলেন। সেকালে সাহেবদের মধ্যেও ভাল লোক অনেক ছিল। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, ঠিক করেছ তুমি!"

লিখিয়া গেলেন ইনফ্লুয়েঞ্জা আর ম্যালেরিয়া এপিডেমিকের জন্যই এতগুলি লোক একসঙ্গে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। রেলের কাজ চালাইবার জন্য বাহির হইতে লোক আনানো হউক। যাইবার পূর্বে তিনি ডি, টি, এস মিস্টার স্কটকে আড়ালে বলিয়া গেলেন—"অগ্নি খাঁটি ইস্পাতের তৈরি শাণিত তরবারি। উহাকে যদি ঠিক মতো ব্যবহার করিতে পার অনেক উপকার পাইবে। বোকার মতো নাড়াচাড়া করিলে কিন্তু রক্তারক্তি হইবার সম্ভাবনা।"

এই ব্যাপারে অগ্নীশ্বরের খাতির আরও বাড়িয়া গেল। অমন দুঁদে স্কটকে নাজেহাল করিয়াছে, একি সোজা লোক!

যে স্টেশনে অগ্নীশ্বর মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন, তাহার দুই স্টেশন পরে এক গ্রামে আমি থাকিতাম। আমি তখন স্কুলে পড়ি। কিন্তু অগ্নীশ্বরের কীর্তিকলাপ আমার অবিদিত ছিল না। তাঁহার চতুর্দিকে যে মহিমা-দ্যুতি বিকিরিত হইতেছিল, তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল অনেক দূর পর্যন্ত। তাঁহার সম্বন্ধে প্রতিটি গল্প পল্লবিত হইয়া আমাদের চিত্তকে রঞ্জিত করিয়া দিত।

এই লোকটিকে প্রত্যক্ষ দেখিবার সুযোগ একদিন আমার ঘটিয়া গেল। আমাদের বাড়িতে আমাদের দূর সম্পর্কীয়া একটি ভগ্নী আসিয়াছিলেন, তিনি সাংঘাতিক নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইলেন। স্থানীয় ডাক্তার কুলদাবাবুর চিকিৎসাসত্ত্বেও রোগ বাড়িতে লাগিল। শেষে স্থির হইল ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়কে ডাকা হোক। আমার উপর ভার পড়িল তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার। আমার বয়স তখন ষোল বছর, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া বাড়িতে বেকার বসিয়া আছি। কুলদাবাবুর পত্র লইয়া গেলাম তাঁহার কাছে। তাঁহার চেহারা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। সত্যিই এ যে জ্বলন্ত অগ্নি।

পত্র পড়িয়া বলিলেন, "আচ্ছা, যাব চারটের ট্রেনে। তুমি খেয়ে এসেছ?"

"জলখাবার খেয়ে এসেছি। খেয়ে নেব এখানে কোথাও হোটেলে—"

"হোটেলে কেন। আমার এখানে খেতে আপত্তি আছে তোমার? ও, আমি মুরগি খাই, সেটা টের পেয়ে গেছ বুঝি—"

কি বলিব, কুণ্ঠিত মুখে চুপ করিয়া রহিলাম

"মুরগি খেয়েছ এর আগে?"

"না"

"খেতে আপত্তি আছে?"

"আছে"

"বিপদে ফেললে দেখছি। মাছ খাও তো?"

"খাই"

"বেশ, মাছের ঝোল ভাতেরই ব্যবস্থা হবে।"

খাইতে বসিয়া অনুভব করিলাম, আমার জন্য মৈথীল পাচক দিয়া আলাদা রান্না করানো হইয়াছে। তিনি নিজে খান বাবুর্চির

হাতে, সাহেবী খানা। তখনও বিবাহ করেন নাই, বাড়িতে স্ত্রীলোক নাই। বাবুর্চি আর খানসামার সংসার। উঠানের একধারে দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড খাঁচায় কতকগুলো মুরগি।

আমি সমস্ত দিন ছিলাম, কিন্তু তাঁহার সহিত কথাবার্তা বিশেষ হয় নাই। তিনি হাসপাতালেই প্রায় সর্বক্ষণ ছিলেন। পড়িবার জন্য আমাকে খানকয়েক বই দিয়া গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'খানাও ছিল। সেটা আগে পড়ি নাই, পড়িয়াফেলিলাম। ট্রেন ছাড়িবার কিছুক্ষণ পূর্বে আসিয়া হাজির হইলেন তিনি। স্নান করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "চল এইবার। ট্রেনের আর বেশি সময় নেই। বইগুলো পড়েছ?"

"ঘরে-বাইরেটা পড়েছি—"

"কেমন লাগল?"

"ভাল লেগেছে। কিন্তু সন্দীপ আর একটু বেপরোয়া হ'লে আরও ভাল লাগত।"

"বাঃ ছোকরা, তোমার তো বেশ বুদ্ধি আছে দেখছি। খুব খুশী হলুম।"

আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া টাই বাঁধিতে বাঁধিতে বলিলেন, "আরও খুশী হয়েছি তুমি মুরগি খাওনি দেখে। আমার গোড়ে গোড় মিলিয়ে তুমি যদি মুরগি খেতে আই উড্ হ্যাভ হোটেড্ ইউ"

কি বলিব চুপ করিয়া রহিলাম।

আমার বোনকে ভাল করিয়া দেখিয়া তিনি গম্ভীর হইয়া গেলেন। তাহার পর বাহিরে আসিয়া আমাদের বলিলেন, "এর তো বাঁচবার আশা নেই। এখানকার ডাক্তারবাবু কি কি ওষুধ দিয়েছেন দেখি।"

প্রেসক্রিপশন বাহির করিয়া দিলাম। কুলদাবাবু ডাক্তারও নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

"আপনি বসুন"

প্রেসক্রিপশনের উপর চোখ বুলাইয়া বলিলেন, "কোন ওষুধই তো বাদ রাখেননি দেখছি। এ ওষুধগুলো কেন দিয়েছেন।"

তিনি প্রেসক্রিপশনের কয়েকটা ঔষধ আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন। কুলদাবাবু কোন উত্তর না দিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন কেবল। ভাবটা যেন, কেন দিয়াছি তাহা তোমার মতো অর্বাচীনকে বলিয়া লাভ কি।

অগ্নীশ্বর কিন্তু না-ছোড়।

"কেন দিয়েছেন—এগুলো?"

সহসা কুলদাবাবুর জরা-কুঞ্চিত মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"দিলে ক্ষতি তো নেই—"

"ও, আপনার চিন্তাধারা নতুন রকম দেখছি। কিন্তু রোগী যে খাটটায় শুয়ে আছে, তার নৈঋ‌ৃত কোণের পায়াটায় একজন বসে যদি দিনরাত হাওয়া করে যায়, তাতেও রোগীর কোন ক্ষতি নেই, সেটা তো আপনার প্রেসক্রিপশনে দেখছি না।"

কুলদাবাবুর ছোট ছোট চক্ষু দুইটি অন্ধকারে বিড়ালের চোখের মতো জ্বলিতে লাগিল, মুখের কালো রঙে বেগুনির ছোপ পড়িল।

"আপনার বয়স কি সত্তর পেরিয়েছে?"

"বাহাত্তর চলছে।"

"আর কেন, এইবার কাশীবাস করুন গিয়ে। ভাল কথা, আপনি কি এখানকার হাসপাতালে চাকরি করেন? এত বয়স পর্যন্ত তো চাকরি থাকবার কথা নয়।"

"না। প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস করি। এখানকার ডাক্তারবাবু ছুটিতে গেছেন, তাই তাঁর হয়ে হাসপাতালে কাজ করছি।"

"ও। আচ্ছা, উঠি।"

ফি কত দিতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "পঞ্চাশ টাকা—"

টাকা আনিবার জন্য বাড়ির ভিতর ছুটিলাম। টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, অগ্নীশ্বর ভুটুনের সহিত আলাপ করিতেছেন। ভুটুনের বয়স ছয় বৎসর। আমার ভাগনা। ইহারই মায়ের নিউমোনিয়া হইয়াছে। কানে গেল—"তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে কে।"

"আমার ছোট মাসী।"

"কোথা থাকেন।"

"পাটনায়।"

"পুরো নাম কি ?"

ভুটুন বলিতে পারিল না।

আমিই বলিলাম, "কমলা বসু"।

টাকা লইয়া অগ্নীশ্বর চলিয়া গেলেন। দিন সাতেক পরে একটি মনি-অর্ডার আসিল ভুটুনের নামে। তাহার ছোট মাসী তাহাকে পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়াছে। আমরা অবাক হইয়া গেলাম। সে তো ইতিপূর্বে কখনও টাকাকড়ি পাঠায় নাই। টাকাটা পাইয়া অবশ্য সুবিধাই হইয়া গেল। ভুটুনের মায়ের শ্রাদ্ধের খরচটা কুলাইয়া গেল। শ্রাদ্ধে কুলদাবাবু ভুরি-ভোজন করিলেন, তাঁহার খাওয়াটা সত্যই দেখিবার মতো হইয়াছিল। আরও কয়েকদিন পরে কমলার চিঠি আসিল। সে লিখিয়াছে, সে তো টাকা পাঠায় নাই।

অগ্নীশ্বরের ওই এক ধরণ ছিল, তিনি যখন কাহারও উপকার করিতেন তখন কাহাকেও সেটা জানিতে দিতেন না। এমন কি উপকৃতকে পর্যন্ত নয়। তাঁহার প্রিয় শিষ্য সুবিমল তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল তিনি কেন এমন করেন।

অগ্নীশ্বর উত্তর দিয়াছিলেন—"ওরে বাপরে, এরকম না করলে রক্ষে ছিল আমার। বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়নি, যদি কারও উপকারটি করেছ, অমনি সে শত্রু হয়ে গেছে তোমার। মেরেই ফেললে ও লোকটাকে শেষ পর্যন্ত। এমনিই তো দু'বেলা খাচ্ছি-পরছি, মোটামুটি সুখে আছি, এতেই তো অগণিত শত্রুসৃষ্টি হয়েছে, তার উপর তাদের পিঠে যদি উপকারের চাবুক পড়ে তাহলে তো ক্ষেপে যাবে তারা, দেশছাড়া করবে আমাকে। অথচ উপকার না করেও পারি না, ওটা একটা রোগ বিশেষ, a sort of exhibitionism, যখন চাগাড় দেয়, তখন বে-এক্তার হয়ে পড়তে হয়। তাই যথাসাধ্য লুকিয়ে করি।"

২

ছাত্রজীবনে অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নাই। দ্বিতীয়বার দেখা হইয়াছিল আরও কয়েক বছর পরে একেবারে বিভিন্ন পরিবেশে এবং পরিস্থিতিতে। তবু তাঁহার সব খবর আমি পাইতাম সুবিমলের কাছে। সে আমার সহপাঠী ছিল, দুইজনে একসঙ্গে আই, এস, সি পড়িয়াছি। সে আই, এস, সি পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে গেল, আমি বি, এস, সি ক্লাশে ভর্তি হইলাম। সুবিমল যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র সেই সময় অগ্নীশ্বর সেখানে ছিলেন। সুবিমল ছাত্রজীবনেই কবিতা-গল্প লিখিয়া সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। অগ্নীশ্বর তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তিনি যখন মেডিকেল কলেজ হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন এবং সুবিমল যখন বারকয়েক ডাক্তারি ফেল করিয়া শেষ পর্যন্ত সাহিত্যকেই পেশারূপে গ্রহণ করিল, তখনও তাঁহার এই আকর্ষণ সমানভাবে প্রবল ছিল।

সুবিমলকে লেখা তাঁহার চিঠিপত্র হইতে বোঝা যায়, তিনি তাহাকে কতটা ভালোবাসিতেন এবং কিভাবে ভালোবাসিতেন। তাঁহার সর্বদা ভয় হইত—ওই যাঃ, পাঁচজনে মিলিয়া এমন একটা প্রতিভাকে বুঝি নষ্ট করিয়া ফেলিল। মেডিকেল কলেজে যতদিন ছিলেন ততদিন যাচ্ছেতাই করিয়া গালাগালি দিতেন তাহাকে। বলিতেন, "দেখ, আর পাঁচজনের মতো গালে-ঠোঁটে রং মেখে, রাংতার গয়না পরে, ফিনফিনে রঙীন শাড়ির বাহার দিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়াতে যেও না। সত্যিকার রসিকের জন্য লেখ, তারই আশাপথ চেয়ে থাক, তপস্যা কর। মতঙ্গমুনির আশ্রমে শবরী যেমন প্রতীক্ষা করেছিল রামচন্দ্রের জন্য, তোমার প্রতীক্ষাও তেমনি হবে।"

সুবিমলকে লেখা কয়েকটা চিঠি আমি পাইয়াছি। পরে বিভিন্ন স্থান হইতে চিঠিগুলি তিনি তাহাকে লিখিয়াছিলেন। এই চিঠিগুলির মধ্যে তাঁহার মনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, সে পরিচয় বাহিরের লোক কখনও পায় নাই। কারণ, সে পরিচয় তিনি কখনও কাহাকেও দেন নাই, দিতে চাহেন নাই।

একটা চিঠিতে লিখিয়াছেন—"আমার লেখা সম্বন্ধে আমি unconcerned থাকতে চাই। কর্ণের সঙ্গে কুন্তীর যে সম্বন্ধ, আমার লেখার সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেকটা সেইরকম। ভবিষ্যদ্বংশীয়দের goggle eyes এবং সিনেমা screen এ দুয়ের মাঝখানে আমার এই ভাগ্যহত অপত্যকে দাঁড় করাবার মতো বুকের পাটা আমার নেই। তুমি লিখেছ, আমার লেখা তোমার ভালো লাগে। আরও দু'একজনের লেগেছে। আমার ছবির একজন সমজদার আছে জানি। আমার ডাক্তারিও একটা আর্ট এবং তাকে আর্ট বলে কেউ কেউ হয়তো চিনতে পেরেছে। কিন্তু এদের কেউ পপুলার হবে না। যদি হয় তো নিজেদের রাধাপুত্র বলে পরিচিত করে তবে হবে। আমার লেখা আর একজনের হাত দিয়ে বেরুলে এত অপাংক্তেয় হবে না। আমার ছবি একদিন আর একজনের নামে ছাপা হবে এবং নাম করবে। আমার ডাক্তারী কোন ছাত্রের মারফৎ হয়তো তাক লাগাবে। কিন্তু আমার নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এদের কোন কল্যাণ নেই। বার্ধক্যের ব্রেন সফনিংয়ের (brain softening) সঙ্গে সঙ্গে এইরকম একটা বিশ্বাস আমার দাঁড়িয়েছে। তোমার লেখা আমাকে পাঠাতে পার। সমালোচনা করব, from my point of view, সমালোচনা মানেই তাই, আমার কেমন লাগল সেইটে স্পষ্ট করে বলা, ম্যাথু আর্নল্ড বা রবীন্দ্রনাথের কথার চর্বিতচর্বণ করা নয়। প্রত্যেক সাহিত্যিকের জীবনেই কিছু না কিছু tragedy আছে, তোমারও নিশ্চয় আছে,

কিন্তু সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারব না অভিজ্ঞতা কম বলে। তাছাড়া তোমার নিজের চোখের দেখা জিনিসই তোমার আঁকায় ফুটবে ভালো, আমার impression হয়তো তোমার কাজে লাগবে না। আমার red হয়তো তোমার green। এ সব শোনবার পরও যদি লেখা পাঠাতে ইচ্ছা হয় পাঠিও—"

চিঠিপত্র হইতে মনে হয় সুবিমল তাঁহাকে লেখা পাঠাইত। একটা চিঠিতে দেখিতেছি—

"তোমার ওই ভুতুড়ে বইটার সম্বন্ধে আমার অনেক কিছু বলবার আছে। কিন্তু চিঠিতে বলা যাবে না। এ রকম লেখায় তুমি অদ্বিতীয়। যেখানে তুমি অদ্বিতীয় সেখানে আমি কোন ত্রুটি সহ্য করব না। তুমি লিখেছ খুব ভালো, কিন্তু সবটা এক sittingএ লিখেছ। একটু রয়ে বসে যদি লিখতে তো five hundred times better হ'ত। বই যত ভালো লাগে তত অস্বস্তি হতে থাকে। A beautiful bust, blinding love, an opportune moment and a ruptured perinium! মনের ভিতর হায় হায় করতে থাকে, কেবল মনে হয়, আহা, যদি দুটো stitch লাগানো হ'ত।

....চিঠিতে আর সমালোচনা করব না। চিঠি এক sittingএ লিখে ডাকে ফেলে দিই। তারপর মনে পড়তে থাকে, "ঐ যাঃ, এখানটায় তো মনের ভাব পরিষ্কার করা হয়নি। ওখানটায় আর একরকম করে লিখলে হ'ত, ওখানটায় দুটো লাইন কম পড়েছে—ইত্যাদি। তারপর বুক চাপড়ানো আর রাত্রে অনিদ্রা, এ আর সহ্য হবে না।"

তবু চিঠিতে সমালোচনা করিতে তিনি ছাড়েন নাই।

আর একটা চিঠিতে দেখিতেছি "তোমার লেখার অনেক লাইন বদলাতে ইচ্ছে করে, অনেক Para rewrite করতে ইচ্ছে হয়,

কিন্তু বাছবার সময় আর সাহস হল না। এরকম বাছা একজনের কাজ নয়। তোমার চাল ডাল মশলাপাতি খুবই ভালো। কেবল কাঁকর বাছা হয়নি। কাঁকর বাছবার সময় তোমার নেই। আমারও নেই। আশা আছে বাংলা দেশের ফোকলা দাঁতে কাঁকরগুলো অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে····।”

আর একটা চিঠি।

“তোমার সঙ্গে সুরে মিললে মনে কর স্নেহ প্রকাশ করছি, সুরে না মিললে মনে কর রাগ করেছি—এ তো মহা মুশকিল দেখছি। সুর মেলা না মেলার সঙ্গে স্নেহ বা রাগের কি সম্পর্ক ?

আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার ও আমার রুচি বিভিন্ন। তোমার সঙ্গে আমার সুর মিলবে না। যৌবনের ঐশ্বর্যে তুমি অজস্র অসংযত বোল ফুটিয়ে চলেছ। আর আমি বৃদ্ধ, কানে কলম আর হাতে হিসাবের খাতা নিয়ে তোমার পিছনে পিছনে ধাওয়া করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম—“হায়, হায়, এত অপচয় কেন ? সমস্ত energyটা একাগ্র হয়ে একটা বোলে নিয়োজিত হলে যে বিশ-মণি আম ফলানো যেত!” তোমার সৃজন-তাণ্ডবে আমার হিতোপদেশ শতধা হয়ে দিক্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়ল দেখে আমি থমকে দাঁড়ালুম। ভেবে দেখলাম, এইটেই ঠিক হয়েছে। তোমার genius তোমাকে যে পথে নিয়ে যাবে সেইটেই তোমার পথ। সে পথে আমার interference হয় নিজে ব্যর্থ হবে, নয় তোমাকে ব্যর্থ করবে। তাই অনেক ভেবে চিন্তে বার্ধক্যের মুখরতা সংযত করলুম, with a jerk, এর মধ্যে রাগ কোথায় ? মাইকেল, বঙ্কিমকে আমি genius মনে করি। কিন্তু তাঁদের প্রতিভা আমার ‘বিজনবাসে সিগারেটের সহচরী’ হয়নি। তা বলে কি তাঁদের উচিত ছিল আমার পছন্দমতো লেখা ? মনে করেছিলুম তুমি ধীরভাবে বসে চিন্তা করলে হয়তো ভালো ছবি আঁকতে

পারবে। কিন্তু দেখছি ধীরভাবে বসে ভাবা তোমার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং আমি তোমার আশা ছেড়ে দিলুম। তোমার উপর নিজের রুচির জোয়াল চাপাবার স্পর্ধাও ছাড়লুম। এ থেকে কি বুঝলে আমি রাগ করেছি? বুঝলেও উপায় নেই।"

এরপর আর একটা চিঠি।

"সমালোচনার শেষকথা বলেছি বলে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখছি প্রতিজ্ঞা রাখতে পারছি না। কারণ একটা কুকর্ম করে ফেলেছি—চিঠিটা বড় রূঢ় হয়ে গেছে। অতটা রূঢ় করবার ইচ্ছা ছিল না। হয়ে গেল শুধু উপমার খাতিরে। ওই আকারান্তের মন জোগাতে দু'একটা খুনখারাপি করা বিচিত্র নয়। তাছাড়া লোককে খোঁচা দিয়ে কথা বলা আমার মজ্জাগত স্বভাব। তোমরা সব কলা গাছ কিংবা পেঁপে গাছ, প্রশস্ত চওড়া-চওড়া পাতা, সুমিষ্ট ফল ফলাও। আর আমি হচ্ছি খেজুর, প্রত্যেক পাতার ডগায় ছুঁচ আছে, ফল যদি বা কখনও ফলে তা প্রায়ই কষা আর আঁটিসর্বস্ব। আমাকে চেঁছে যে সুমিষ্ট রস বার করতে পারবে, সেরকম পাশী তো দেখতে পাই না। রূঢ়তার জন্য ক্ষমা চাইছি—"

এইসব চিঠি পড়িয়া কাহারও যদি ধারণা হয় যে, সুবিমলের লেখা তিনি ভালবাসিতেন না, তাহা হইলে ধারণাটা ভুল হইবে। কারণ আমি তাঁহার একজন বন্ধুর নিকট ঠিক উলটা কথা শুনিয়াছি। কথায় কথায় সুবিমলের কথা উঠিল। ভদ্রলোক বলিলেন, "কাল অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের কাছে গিয়েছিলাম। সুবিমলের লেখার কথা ওঠাতে তাকে বললাম, সুবিমলের evolutionটা দেখছো?"

অগ্নীশ্বর বললে—"হাঁ, দেখবার মতো। আমি মাঝে মাঝে তার নিন্দে করেছি। লম্বা লম্বা উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখি।" আমি বললাম, "কিছু দরকার হবে না, পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া he is bound to come out."

অগ্নীশ্বর শুনে লাফিয়ে উঠল, বলল, আমি add করছি yes, resplendent ruthless and irresistible—এই আমার বিশ্বাস। কারুর কাছে সমালোচনার কাঙাল হবার তার দরকার নেই। He has grown beyond it and above it."

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "অগ্নি এখনও ঠিক তেমনি আছে। আমার সামনে এক প্রবীণ ডেপুটিকে যেভাবে অপমানটা করলে তা আর কহতব্য নয়। ওই জন্যে ওর কিছু হল না। তা না হলে অত ভালো ডাক্তার, অমন বিদ্বান লোক, ওর কি টাকার ভাবনা হবার কথা? ওর নিজের অবশ্য ভাবনা নেই, কিন্তু দেখে মনে হয় ওর চেয়ে অনেক বেশি নিকৃষ্ট ওর সহপাঠীরা যতটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে ও ততটা পারে না। মাইনেটিই ওর সম্বল। ওই আগুনের কাছে কে যাবে বল ছ্যাঁকা খাবার জন্যে। প্রবীণ ডেপুটিকে দেখে কষ্ট হল আমার—"

প্রশ্ন করিলাম, "কি হয়েছিল কি—"

"যা সাধারণত হয় তাই, human weakness, কিন্তু human weaknessকে ক্ষমা করার লোক তো অগ্নীশ্বর নয়। ভদ্রলোকের হাঁটুতে ব্যথা হয়েছিল। বোধহয় অনেকদিন আগেই হয়েছিল। তিনি বললেন, "অগ্নিবাবু, এ হাঁটু তো সারল না, কত আর নেংচে নেংচে বেড়াই বলুন, আপনার প্রেসক্রপশনটাই দিন, ট্রাই করে দেখি ওটা—"

"আপনাকে তো প্রেসক্রপশন দিয়েছিলাম একটা মাস তিনেক আগে—খাননি সে ওষুধ?"

অগ্নীশ্বরের প্রশ্ন শুনেই বুঝলাম গতিক ভালো নয়।

ডেপুটি বললেন, "না, সেটা আর খাওয়া হয়নি। আমার বেয়াই বললেন বিধানবাবুকে দেখাতে। তিনি ব্লাড কেমিস্ট্রি করালেন, পাইখানা পেচ্ছাবও পরীক্ষা করালেন। তারপর এমন এক ওষুধ লিখে দিলেন যে, ওষুধ জোগাড় করতেই মাসখানেক লেগে

গেল, এখানে পাওয়া গেল না, বম্বে থেকে আনাতে হল, একটি গাদা দাম লাগল, কিন্তু কিচ্ছু হল না। তারপর গেলাম ব্রাউন সাহেবের কাছে, তিনি মালিশ দিলেন, ইনজেকশন দিলেন, ওষুধও খাওয়ালেন চার-পাঁচরকম—"

অগ্নীশ্বর জিগ্যেস করলেন, "আমার প্রেসক্রপশনটা ব্যবহারই করেননি ?"

"না, সেটা আর ব্যবহারই করা হয়নি। হারিয়েও ফেলেছি সেটা। দিন আর একবার লিখে দিন, ট্রাই করে দেখি এবার ওটা—"

"আর তো লিখব না। সেবারই একটা অন্যায় করে ফেলেছিলুম ফি নিইনি—"

ডেপুটিবাবু একটু থতমত খেয়ে গেলেন। তারপর কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, "বেশ, এবার ফি দেব। কত ফি নেন আপনি—?"

"লক্ষ টাকা দিলেও আর লিখব না"—গর্জন করে উঠল অগ্নীশ্বর। তারপর একটু থেমে বলল—"একটি শর্তে লিখতে পারি, যদি ওই ফোলা হাঁটু গেড়ে করজোড়ে প্রার্থনা করেন—'দয়া করে ওই প্রেসক্রপশনটা আবার লিখে দিন।' তবেই দেব, তা না হলে নয়—"

ভদ্রলোক গুম হয়ে বসে রইলেন মিনিট খানেক। তারপর উঠে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, "আপনি যে এত অভদ্র, তা জানা ছিল না আমার—"

অগ্নীশ্বর বসে বসে পা দোলাতে দোলাতে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। এ লোকের কখনও প্র্যাকটিস হয় ?"

সত্যই অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের প্র্যাকটিস হয় নাই। মাঝে মাঝে দুই-এক জায়গায় তাঁহার নাম হইয়াছে, হৈ হৈ করিয়া প্র্যাকটিসও হইয়াছে, কিন্তু তাহা অল্পদিন মাত্র। বদলির চাকরি, এক জায়গায় বেশি দিন তিনি থাকিতে পান নাই।

৩

ইংরেজের কবল হইতে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিবার জন্য যে সব বাঙালী ছেলেমেয়ে একদিন জীবনপণ করিয়াছিল, যাহারা দলে দলে জেল ভরতি করিয়াছিল, ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়াছিল, দ্বীপান্তরে গিয়াছিল, পুলিশের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়াছিল, যাহাদের ঘরে-বাহিরে কোথাও শান্তি ছিল না, মা-বাপ আত্মীয়-বন্ধুরাও যাহাদের আপনার লোক বলিয়া স্বীকার করিতে ভয় পাইতেন, একটা বিরাট আদর্শের প্রেরণায় যাহারা নিজেদের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়াছিল, কিন্তু সর্বহারার গান গাহিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায় নাই, বরং যাহারা নিজেদের সর্বতোভাবে লুকাইয়া রাখিয়াই লোকচক্ষুর আড়ালে বিলীন হইয়া গিয়াছে, আমার মতো লোকও যে একদিন তাহাদের সঙ্গে ছিল একথা ভাবিলে আজও বিস্ময় এবং লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়ি। লজ্জার কারণ আমি এখন নামজাদা পুলিশ অফিসার বলিয়া জন-সমাজে পরিচিত। ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সহিত আমার প্রথম যখন আলাপ হয় তখন আমার যে নাম ছিল সে নাম এখন আমার নাই, সে নামের ব্যক্তিটি বহুপূর্বে মারা গিয়াছে।

আজ জীবনের অপরাহ্ণে বসিয়া বসিয়া অতীত দিনের সেই ঘটনাগুলি ভাবিতে গিয়া একটি কথাই কেবল মনে হইতেছে, এ সবের মধ্যে আমার কি কোন হাত ছিল? অজানা কোন উৎস হইতে অপ্রত্যাশিত ঘটনার ধারা প্রবলবেগে আসিয়া বারবার আমার জীবনের সবকিছু ওলট-পালট করিয়া দিয়াছে, পুরাতন পরিবেশ বারম্বার বিপর্যস্ত হইয়া নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে, পরিচিত লোক অপরিচিতের পর্যায়ে পড়িয়াছে, অপরিচিত লোক অত্যন্ত পরিচিত

হইয়াছে। গৃহকে শ্মশান করিয়াছে, কখনও শ্মশানই গৃহ হইয়াছে, ছবির পর ছবি বদলাইয়াছে, একদিন যাহাকে সুখ-শান্তির আদর্শ বলিয়া ভাবিয়াছি, দুইদিন পরে তাহাই অসুখ ও অশান্তির আকর হইয়াছে। আমার এই সদাপরিবর্তনশীল জীবনে একটিমাত্র ছবির কেবল পরিবর্তন দেখি নাই, সে ছবি অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের। আমার জীবনে কয়েকবারই তিনি অপ্রত্যাশিতরূপে আসিয়াছেন ও চলিয়া গিয়াছেন, প্রতিবারই তাঁহাকে একরকম দেখিয়াছি। তরবারির মতো তীক্ষ্ণ, অগ্নির মতো উজ্জ্বল, অন্তরের অন্তস্থলে কিন্তু স্নেহ-করুণার ফল্গু বহমান। বজ্রের মতো কঠোর অথচ কুসুমের মতো মৃদু এক তাঁহাকেই দেখিয়াছি।

আজ তাঁহার জীবন-কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি নিজের দায়ে। কারণ ঋণশোধ করিবার অন্য উপায় নাই।

মনে হইতেছে, আমার মতো তিনিও সারাজীবন একটা আলেয়ার পিছনে পিছনে ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন। সে আলেয়াটা কখনও ডাক্তারি, কখনও সাহিত্য, কখনও নাস্তিকতা, কখনও শাস্ত্রবিচার, কখনও দেশভক্তি, কখনও স্বদেশবাসীর প্রতি নিদারুণ ঘৃণা—নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পথে-বিপথে লইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে ভাবিয়াছি, এই আলেয়ার মধ্যে তিনি কি পাইতে চাহিয়াছিলেন। সত্য? আনন্দ? জনপ্রিয়তা? অর্থ? আমার মনে হয়, ইহার একটাও তিনি চাহেন নাই। জনপ্রিয়তা তো তাঁহার দু'চক্ষের বিষ ছিল। তিনি যখন সিনেমা দেখিতে যাইতেন, খোঁজ লইতেন কোন্ সিনেমাটায় সবচেয়ে কম ভীড়, যখন কোনও হোটেলে যাইতেন, মেনুর কোন্ খাদ্যটা লোকে সবচেয়ে কম খায় সেইটা খোঁজ করিয়া তাহাই আনিতে বলিতেন। তাঁহার সহপাঠী এক ডাক্তারের মুখে এরূপ নানা গল্প শুনিয়াছি। তাঁহার ধারণা ছিল পেটের দায়ে বা পপুলারিটির লোভে কোনও

প্রথম শ্রেণীর গুণী কখনও নিজেদের সুর নামাইয়া ফেলেন না। সুবিমলকে একবার লিখিয়াছিলেন—'তোমার গল্পের সাহিত্যিক নায়ক পেটের দায়ে পয়সার জন্যে অপরের নামে গল্প-কবিতা লিখতে লাগল, এটা আমার তত ভালো লাগেনি। কি জাতের সাহিত্যিক লোকটা? আমি তো ভাবতেই পারি না যে, রবীন্দ্রনাথ বা গোপেশ্বর বাঁড়ুয্যে পেটের দায়ে গান গেয়ে গেয়ে চানাচুর ফেরি করে বেড়াচ্ছেন! তুমি ওকে যদি সত্যিকার ভালো সাহিত্যিক করতে চাও, ও ছবি মুছে ফেল'।

সত্য-অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি এবং সত্যনিষ্ঠা তাঁহার ছিল নিশ্চয়, না থাকিলে তিনি অত বড় ডাক্তার হইতে পারিতেন না। কিন্তু সত্যকেই তিনি আকুল হৃদয়ে সারা জীবন সন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছেন তাহা তো মনে হয় না। আমার নিকট আজ যে তিনি নমস্য তাহা তো তাঁহার মিথ্যা আচরণের জন্যই। তিনি সুন্দরকে ভালবাসিতেন, সত্যকে নয়। তাঁহার সত্যের আদর্শ তাঁহার নিজের কাছে ছিল, তাহা আর পাঁচজনের সত্য নয়, আইনের সত্য নয়, ধর্মের সত্য নয়, শাস্ত্রের সত্য নয়, তাহা তাঁহার নিজের সত্য এবং সে সত্যের প্রধান গুণ, (সম্ভবত একমাত্র গুণ) তাহা সুন্দর।

আমি যতদূর খবর জানি জীবন তাঁহার নিরানন্দ ছিল। তাঁহার এই জীবনী লিখিবার জন্য আমি তাঁহার আত্মীয়-স্বজনদের সহিত দেখা করিয়া যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি তাহা হইতে মনে হয় পারিবারিক জীবন তাঁহার সুখের ছিল না। পারিবারিক জীবনের মেরুদণ্ড যে স্ত্রী, তাঁহার সহিত তাঁহার জাতে মেলে নাই। শতকরা নিরানব্বুই জনেরই মেলে না। বিবাহের সুসজ্জিত মণ্ডপে শঙ্খধ্বনি-উলুধ্বনির মধ্যে যে-সব শুভমিলন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাদের অধিকাংশই অসবর্ণ বিবাহ, কঠিনের সহিত কোমলের, কবির সহিত

অকবির, সরলতার সহিত প্রতারণার, লম্পটের সহিত সতীর, অসতীর সহিত সাধুর, কতরকম গরমিলই যে হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। অধিকাংশ লোকই দুর্ভাগ্যটাকে আব-আঁচিলের মতো মানিয়া লইয়া ভবিতব্যের দোহাই দিয়া সান্ত্বনা পাইবার চেষ্টা করেন। অগ্নীশ্বরের প্রকৃতি ছিল ঠিক উলটা ধরনের, কোন-কিছু নির্বিচারে মানিয়া লওয়া তাঁহার ধাতে ছিল না। বিশেষত তিনি যখন উপলব্ধি করিতেন যে, যে-ফাঁদে তিনি পড়িয়াছেন তাহা হইতে উদ্ধারের আর উপায় নাই তখন তিনি যেন ক্ষেপিয়া যাইতেন। তাঁহার বিবাহ ব্যাপারটা অনেকটা ফাঁদের মতোই হইয়াছিল। নিজে বিবাহ করিবার পূর্বে তিনি তাঁহার বিধবা বোনের আবার বিবাহ দিয়াছিলেন। সেজন্য কিছুকাল তাঁহাকে গোঁড়া-সমাজে একঘরে হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, পাত্র হিসাবে তিনি প্রথম শ্রেণীর পাত্র ছিলেন, দুই-একটি ভালো ঘর হইতে তাঁহার সম্বন্ধও আসিয়াছিল, কিন্তু যেই তাহারা খবর পাইল যে ইনি বিধবা বোনের আবার বিবাহ দিয়াছেন অমনি সরিয়া পড়িল। অগ্নীশ্বর তাঁহাদের একজনকে নাকি বলিয়াছিলেন, "দেখুন, তামাক খাবার যদি ইচ্ছে হয়, নিজের হুঁকো কেনবার পয়সা আমার আছে। আর শাল-পাতায় বসে আপনাদের ওই ছ্যাঁচড়া-চচ্চড়ি-বোঁদে-দই মাখামাখি পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসবার প্রবৃত্তি আমার কোনকালে নেই। আমার বক্তব্যটা ডি, এল, রায় নামক লেখক আরও ভালো করে বলেছেন তাঁর 'একঘরে' প্রবন্ধে। পড়ে দেখবেন— ও, বেগ ইওর পার্ডন, যা আপনার পক্ষে অসম্ভব তাই করতে বলছি, আপনি ব্রাহ্মণ যে, পড়াশোনা তো আপনার ধাতে সইবে না!"

আঃ, এসময়ে আবার কে ফোন করিল।

"হ্যাঁ, আমি কথা বলছি। কি বলুন, ও দলকে দল ধরা

পড়েছে? বাঃ, সুখবর খুব। এখন লক্‌আপে রেখে দিন সবাইকে। জামিন যাতে না পায় সে চেষ্টাও করতে হবে। ওরা ছাড়া পেলে ওদের আর ধরতে পারবেন না। আচ্ছা, গুড্ নাইট। থ্যাঙ্ক ইউ—"

যাক্, মস্ত একটা শিরঃপীড়া সহসা সারিয়া গেল। একটা বেদে-বেদেনীর দল বহুদিন হইতে জ্বালাইতেছিল।

হ্যাঁ, কি বলিতেছিলাম? অগ্নীশ্বরের পারিবারিক জীবনের কথা। শেষ পর্যন্ত একটা পরিবার তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়া ছিল। একটু ভণ্ডামী করিলেই যে অগ্নীশ্বরের মতো সৎপাত্র পাওয়া যায় এ বুদ্ধি অন্তত একটি ভদ্রলোকের মাথায় খেলিয়াছিল। তিনি একদিন বিবাহের প্রস্তাব লইয়া অগ্নীশ্বরের কাছে গেলেন। অগ্নীশ্বরের পিতা-মাতা তখন কেহই বাঁচিয়া নাই, অগ্নীশ্বর নিজেই তখন নিজের বিবাহের কর্তা। শুনিয়াছি, কন্যার পিতা যখন অগ্নীশ্বরের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেন তখন নাকি বলিয়াছিলেন, "আমার একটি সুলক্ষণা গৃহকর্মনিপুণা মেয়ে আছে, সেটিকে আপনার হাতে সমর্পণ করতে চাই।"

অগ্নীশ্বর উত্তর দিলেন, "শাস্ত্রে সুলক্ষণা মেয়ের যা বর্ণনা পড়েছি, তাতে মনে হয়েছে সুলক্ষণা মেয়ে মানে কেষ্টনগরের পুতুল একটা। পুতুল বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই। আর গৃহকর্মনিপুণা মানে যদি কম্বাইণ্ড চাকরানি আর রাঁধুনি হয় তাহলেও—"

"না, না অতটা কিছু নয়। গেরস্ত ঘরের মেয়েরা সাধারণত যেমন হয়, তেমনি আর কি। দেখুনই না একদিন—"

"পাঁচ মিনিটের চোখের দেখা দেখে কি হবে বলুন। তার রক্তে সিফিলিস আর ফুসফুসে টি, বি, আছে কি না, টনসিল দুটো কেমন, এই সবই দেখতে হয়। এসব দেখতে দেবেন?"

"বেশ, ইচ্ছে হয়তো দেখুন। আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আমি গরীব লোক, ওসবের জন্য বেশি পয়সা খরচ করা আমার ক্ষমতায় কুলোবে না—"

এই সরল উক্তিতে গলিয়া গেলেন অগ্নীশ্বর। বলিলেন, "বেশ, দেখব না কিচ্ছু। কিন্তু আপনি একটা কথা জানেন কি? আমার বিধবা বোনের আমি বিয়ে দিয়েছি।"

"জানি। তাতে আমার আপত্তি নেই।"

"আমি মুর্গি, শুয়ার, গরু সব খাই। জাত মানি না। আমার রাঁধুনী মুসলমান বাবুর্চি, আমার যে চাকর জল তোলে সে মেথর। এসবে আপনার আপত্তি নেই তো?"

"কিছুমাত্র না। এই সবই তো দরকার আজকাল। সেকেলে গোঁড়ামি না থাকাই তো বাঞ্ছনীয়।"

অগ্নীশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিলেন, তাহার পর বলিলেন, "বেশ, দিন ঠিক করুন। আপনার মেয়েকেই আমি বিয়ে করব।"

"কবে দিন ফেললে সুবিধে হবে—"

"কালই ফেলতে পারেন, কাল পরশু দু-দিন ছুটি আছে। আমাকে অবশ্য রুগী দেখতে বেরুতে হবে, তবে আপিসের ছুটি আছে। জগু আর কার্তিককেও পাওয়া যাবে—অন্তরঙ্গ লোক। অবসর পেলে ওদের সঙ্গে বসেই পর-চর্চা করি। ওদের দুজনেরই কাল ছুটি—"

"অত তাড়াতাড়ি আমি পারব না। অন্তত মাসখানেক সময় দিতে হবে আমাকে—"

"বেশ, তাই নিন।"

ওই পাত্রীর সহিতই অগ্নীশ্বরের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরদিন তিনি তাঁহার বন্ধুদের বলিলেন, "তোমরা শুভদৃষ্টির সময়

আমার চশমাটা চোখ থেকে খুলে নিলে, বৌয়ের মুখ দেখে কি মনে হল জান? মনে হল সারা মুখময় পক্‌সের (pox) গুটি বেরিয়েছে, আর প্রত্যেকটি গুটির মুখে পুঁজ। পরে অবশ্য বুঝেছিলাম, ওগুলো চন্দনের ফোঁটা।"

তাঁহার স্ত্রীর সম্বন্ধে তাঁহার আর এক উক্তি তাঁহার এক বন্ধুর চিঠিতে পাইয়াছি।

"আমাদের কি রকম মিল হয়েছে জান? একেবারে রাজযোটক। আমি সজারু আর উনি তুলতুলে খরগোস। একটি ছোট্ট খাঁচায় পাশাপাশি বাস করছি। কারও পালাবার উপায় নেই। যতদিন না একজনের মৃত্যু হচ্ছে, ততদিন আলিঙ্গন-বদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। ঘৃণ্যতম খুনেরাও কি জেলে এত কষ্ট ভোগ করে? ইচ্ছে করলে ওকে খাঁচাটা থেকে দূর করে দিতে পারি, আমাদের দেশে এ রকম পৌরুষের অনেক নজীর আছে। কিন্তু ওর ভীরু ভীতু চোখ দুটোর দিকে চাইলে সব কেমন গুলিয়ে যায়। অথচ ওর জ্বালায় আমাকে বাবুর্চি তাড়াতে হয়েছে, ফাউল রোস্টের বদলে সুক্তো খেতে হচ্ছে, দুঘণ্টা ধরে পুজো করে, হঠাৎ আচমকা মাথায় গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেয়। বকলে বোকার মতো চেয়ে থাকে ফ্যালফ্যাল করে। এর চেয়ে বেশি দুর্গতি কল্পনা করতে পার? সেদিন একটা দূরের কলে গেছি, রুগীর বাড়িতে পকেট থেকে স্টেথোসকোপ বার করতে গিয়ে কতকগুলো শুকনো ফুল আর বেলপাতা ঝরঝর করে মাটিতে পড়ে গেল। পাছে আমার অমঙ্গল হয়, এইজন্যে লুকিয়ে পুজোর ফুল দিয়ে দিয়েছে আমার প্যাণ্টের পকেটে। ভাবলুম বাড়ি গিয়ে খুব বকব। কিন্তু পারলুম না। দূর থেকেই দেখতে পেলুম, সে জানলার ধারে বসে আছে আমার আশাপথ চেয়ে। চোখে পড়ল ঢলঢলে মুখখানা, যৌবন উপচে পড়ছে সর্বাঙ্গ দিয়ে। বকতে পারলুম না। কিন্তু

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, ছি, ছি এ কি degradation, কি শোচনীয় অধঃপতন। খানিকটা মাংস-স্তূপের লালসায় আমার ভিতরকার পশুটা আমার মনুষ্যত্বের গলা টিপে ধরছে, আর আমি সেটা সহ্য করছি। যার সঙ্গে আমার মনের মিল নেই, বুদ্ধির সমতা নেই, চিন্তার যোগ নেই, তার সঙ্গে ক্রমাগত প্রেমের ভাণ করে যেতে হচ্ছে। আমার মনে হয়, এ শুধু আমার ট্রাজেডি নয়, বিশ্বব্যাপী ট্রাজেডি। কিন্তু এর থেকে তুমি যেন মনে করে বস না যে আমি সেক্‌স-বিরোধী। মোটেই তা নয়, এ বিষয়ে আমি সাবেক আর্য-ঋষিদের সঙ্গে একমত। আমিও তাঁদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে চাই, 'প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ।' মহাভারতের বীররা মামাতো বোনদেরও বিয়ে করতেন, অর্জুন সুভদ্রাকে, শিশুপাল ভদ্রাকে, পরীক্ষিৎ ইরাবতীকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁরা কন্যারত্ন পেলেই আহরণ করতেন সেটি, ভীম রাক্ষসী হিড়িম্বাকে পর্যন্ত ছাড়েনি, অর্জুন মণিপুরী চিত্রাঙ্গদাকে, অনার্যা নাগকন্যা উলুপীকে পর্যন্ত বাগিয়েছিলেন। ধীবর কন্যা সত্যবতীর সঙ্গে পরাশর ঋষির কাণ্ডকারখানা তো জানই। জীবন্ত আর্যদের এইসব প্রাণোচ্ছল বীর্য-গর্ভ কাহিনীর সঙ্গে পরবর্তী যুগের স্মৃতি-শাসিত সাবধানী সমাজের তুলনা করলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। ওই, বিরাট-পক্ষ আকাশচারী মহাবিহঙ্গের দল কি করে' কোন মন্ত্রে মুখস্ত-বুলি-আওড়ানো খাঁচার পাখী হয়ে গেল সব! না, আমাকে তুমি ওই নিন্‌কম্‌পুপ্‌দের দলে ফেল না। আমি ওই সতীত্ববিলাসী ফোঁটা-তিলকধারী মতলববাজ ভণ্ডদের কাছ থেকে সহস্র হস্ত দূরে থাকতে চাই। বাজী শৃঙ্গীদের চেয়েও ভয়ানক ওরা। কিন্তু আমি যে কথাটা তোমাকে বোঝাতে চাচ্ছি সে কথাটা হচ্ছে এই যে, শুধু আমাদের দেহ নেই, মনও আছে। দেহের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বারবার সে মনটার টুঁটি টিপে ধরতে হচ্ছে এইটেই দুঃখ। প্রাচীন

গ্রীক বা আর্যদের মতো ফালাও কারবার করবার সুযোগ তো আমাদের নেই, তাগদও নেই। ওই একটি পরিবার নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আমি যখন আইনস্টাইনের বই বা রুপার্ট ব্রুকের সনেট নিয়ে মত্ত, তখন আমার অর্ধাঙ্গিনী মত্ত সিনেমা-স্টারদের নিয়ে। আমার মন যখন নর্থ পোলে জ্যাক লণ্ডনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার অর্ধাঙ্গিনীর মন তখন ব্যস্ত শাড়ির পাড়, ব্লাউসের ছিট, আর ধোপা-দর্জি নিয়ে। দু-জন দু-জগতে বাস করি। 'জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে। জীবন-বীণা ঠিক স্বরে তাই বাজে না রে'। মাঝে মাঝে এ সন্দেহও হয় বীণা বাজাচ্ছি, না, ক্যানেস্তারা পিটছি! কে জানে। অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করছি কিন্তু—যাই করি।"

সজারুর কাঁটার খোঁচায় রক্তাক্ত কলেবর হইয়া খরগোসটি কিছুদিন বাঁচিয়া ছিল, কিন্তু বেশী দিন নয়। শুনিয়াছি, স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি নাকি তাঁহার এক ভাইকে বলিয়াছিলেন, "আমার কাছ থেকে পালাও তোমরা। আমি খুনে। কথায়, ভঙ্গীতে, ব্যবহারে সারাজীবন ছোরাছুরি চালিয়ে এসেছি, কিন্তু যে শত্রুর উদ্দেশ্যে চালিয়েছি, সে মরছে না, সে অমর, মরে যাচ্ছে আমার নিজের লোকেরা। তোমরা বাঁচতে চাও তো পালাও আমার কাছ থেকে—"

তাঁহার কয়েকটি ছেলেমেয়ে হইয়াছিল জানি। শুনিয়াছি ছেলেমেয়েদের তিনি অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন, রূপে গুণে অমন ছেলেমেয়ে নাকি আর কাহারও হয় না। আমি জানি এটি অসুখী লোকের লক্ষণ। যাঁহারা আত্মপ্রশংসার ঢাক বাজাইয়া অপরের কান বধির করিয়া তোলেন, তাঁহারা আসলে নিজেদের অন্তরের হাহাকারটাকেই আত্মপ্রশংসার ঢক্কা নিনাদে স্তব্ধ করিয়া দিতে চান। আসল সত্যটা অন্তর্যামী, মন ঠিক জানিতে পারে; কিন্তু সে

সত্য যদি বেদনাদায়ক হয়, বাহিরে সেটা স্বীকার করিতে পারে না অনেকে, প্রশংসার মুখোশ পরাইয়া সেটা ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। অগ্নীশ্বরের মতো লোকও যে ইহা করিতেন তাহা বিশ্বাস হয় না। তাঁহার পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই, হয়তো যাহা শুনিয়াছি তাহা ভুল। একটি ঘটনা কিন্তু জানি যাহা ভুল নয় এবং যাহার তীব্র আলোকে অগ্নীশ্বর আজও আমার নিকট অদ্ভুত বিস্ময়ের মতো হইয়া অছেন। যখনই তাঁহাকে কল্পনা-নেত্রে দেখি, মনে হয়, তিনি এমন একটা আলোকের পরিবেশের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন যে, তাঁহার কাছাকাছি যাইবার সাধ্যও আমাদের নাই। তাঁহার ছেলে বিবাহ করিয়াছিল এক ভিন্ন জাতের মেয়েকে। ভিন্ন জাত বলিয়া অগ্নীশ্বরের আপত্তি ছিল না, কিন্তু যেই তিনি শুনিলেন কন্যার পিতা খুব বড় লোক, জামাইকে নগদ ত্রিশ হাজার টাকা, একটি মোটরকার এবং কলিকাতায় একখানা বাড়ি যৌতুক স্বরূপ দিবেন, অমনি তিনি সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি করিলেন। তখন তাঁহার নিজের অবস্থা খুব খারাপ, চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করাতে আয় অর্ধেকেরও কম হইয়া গিয়াছে, কোথাও প্র্যাক্‌টিস জমে নাই। কলিকাতায় একটা সরু গলিতে স্যাঁতসেঁতে একতলা ঘরে বাস করেন।

ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, "এ বিয়েতে আমি মত দিতে পারলুম না।"

ছেলে বলিল, "কেন, আগে তো মত দিয়েছিলেন, এখন সব ঠিক হয়ে গেছে, এখন আবার অমত করছেন কেন—"

"আগে মত দিয়েছিলুম, আমার ধারণা হয়েছিল তুমি একটা আদর্শের জন্য বিয়ে করছ। ঝুটো ব্রাহ্মণত্বের মাথায় লাথি মেরে প্রেমকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে বসাচ্ছ। এখন দেখছি তা নয়, তুমি বিয়ে করছ টাকার লোভে।"

"কিন্তু বিয়ের দিন তো ঠিক হয়ে গেছে—"

"ও বিয়েতে আমি যাব না। আমাকে বাদ দিয়ে যদি তোমার বিয়ে করবার প্রবৃত্তি হয়, যাও গিয়ে করে এস—"

অগ্নীশ্বরের এক ছোট ভাই তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—"বিয়ের যখন সব ঠিক হয়ে গেছে তখন তোমার না যাওয়ার কোন মানে হয় না। তুমি না গেলেও বিয়ে হবে, তুমি গেলে দেখতে শুনতে একটু শোভন হত। তুমি যাচ্ছ না কেন—"

"আমার ছেলেকে চাঁদির জুতো মারতে মারতে গলায় গামছা দিয়ে হিড় হিড় করে ছাঁদনাতলায় নিয়ে যাচ্ছে, এ দৃশ্য দেখা আমার পক্ষে শক্ত।"

"কেন, বড়লোক হওয়াটা কি অন্যায়? কোন ধনী যদি তার জামাইকে গাড়ি বাড়ি টাকা দেয় সেটা কি তার অপরাধ?"

"পায়ের অপরাধ কখনও থাকে না। যে পা চাটে অপরাধ তারই।"

"এটাকে পা-চাটা বলে মনে করছ কেন। সিধু সত্যিই ভালবেসেছে কমলাকে। এ কথাটা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন—"

"তোমার সিধু ওই রেবা নার্সের সঙ্গে যখন ঘোরাঘুরি করত তখনও লক্ষ্য করেছিলাম, তার মুখের ভাবটা রসে-ডোবানো মালপোর মতো হয়েছিল। আমি প্রত্যাশা করেছিলুম বিয়ের প্রস্তাব এল বুঝি। কিন্তু যেই তোমার সিধু কমলার সন্ধান পেলে অমনি সব বদলে গেল। রসে ডোবানো মালপো দেখতে দেখতে হয়ে গেল কেঠো লেড়ো বিস্কুট। রেবার বাবার ব্যাংক ব্যালান্স যদি কমলার বাবার ব্যাংক ব্যালান্সের চেয়ে বেশী হত তাহলে তোমার সিধু ওই দিকেই ঝুঁকত—"

"এটা তুমি গায়ের জোরে বলছ। এ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কি যুক্তি আছে তোমার।"

"যুক্তি দিতে পারব না। কিন্তু একটা কথা মনে রেখ আমি ডাক্তার। এক নজরেই অনেক সময় ঠিক রোগটা ধরতে পারি। প্রমাণ পাওয়া যায় অনেক পরে। এ বিষয়ে আমার ভুল হয়নি।"

"দেখ, সিধুর মা নেই, বৌদি বেঁচে থাকলে কি তুমি—"

"তোমার বৌদি বেঁচে থাকলে এ বিয়ে হত না। সোনার বেনের মেয়েকে সে কিছুতেই পুত্রবধূ করতে রাজি হত না। সিধু জোর করলে সে গলায় দড়ি দিত, তবু রাজী হত না।"

তাঁহার ভাই তবু ছাড়েন নাই।

"তুমি তো অত অবুঝ নও। তলিয়ে ভেবে দেখ না ব্যাপারটা, অনিবার্যকে নিবারণ করবার চেষ্টা করছ কেন। ছেলে বড় হয়েছে, ছেলেও খুব ভালো—তাছাড়া সমস্ত ব্যাপারটা যদি ভালো করে ভেবে দেখ, তাহলে—"

অগ্নীশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল ভাবিলেন। তাহার পর বলিলেন, "না, আমি পারব না। যে দুধে কেরোসিন তেলের গন্ধ ছাড়ছে, সে দুধ আমি গিলতে পারব না। কিছুতেই পারব না।"

বিবাহ যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু অগ্নীশ্বর সে বিবাহে যোগদান করেন নাই। এই ঘটনার সমস্ত বিবরণ আমি তাঁহার ভাইয়ের নিকট হইতে শুনিয়াছি।

এ ঘটনা কিন্তু এখানেই শেষ হয় নাই। বিবাহের কিছুদিন পরে তাঁহার নববৈবাহিক তাঁহাকে একটি পত্রাঘাত করিয়াছিলেন। পত্রের মর্ম—"আমার কয়েকটি চায়ের বাগান এবং কোলিয়ারী আছে। তাছাড়া একটা কাপড়ের কলও আমাকে চালাইতে হয়। প্রত্যেক জায়গায় আমাকে ডাক্তার রাখিতে হইয়াছে। আমার ইচ্ছা, এইসব ডাক্তারদের ঠিকমত চালাইবার জন্য একজন চীফ মেডিকেল অফিসার নিযুক্ত করা। আপনি একজন অভিজ্ঞ প্রবীণ চিকিৎসক। আপনি যদি এই ভারটি গ্রহণ করেন, আমি

অনুগৃহীত হইব। এ সমস্ত সম্পত্তি তো আপনারই পুত্রের, আপনি ইহার তত্ত্বাবধানের ভার লইলে নিশ্চিন্ত হইতে পারি।”

অগ্নীশ্বর উত্তর দিলেন, “আপনার চিঠি পেলাম, কিন্তু আপনার প্রস্তাবে রাজী হতে পারলাম না। আমি একটু ক্ষ্যাপাটে গোছের লোক। রবি ঠাকুরের ক্ষ্যাপা পরশ-পাথর খুঁজে বেড়াত, আমি সারাজীবন খুঁজে বেড়িয়েছি স্বাধীনতা, যা এদেশে পাওয়া অসম্ভব। যখন ডাক্তারী পাশ করে বেরুলাম, তখন মনে হয়েছিল এটা স্বাধীন ব্যবসা, এবার বোধ হয় স্বাধীনতার আস্বাদ কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই বুঝলুম, ও বাবা, এদেশে স্বাধীন ব্যবসা করা মানে সকলের মন রেখে চলা। পদি পিসি থেকে আরম্ভ করে গুরুঠাকুর, দালাল, দোকানদার সকলের পায়ে তেল দিতে হবে। খোশামোদ করতে হবে গাঁয়ের কোয়াক্‌দের, প্রতিযোগিতা করতে হবে কম্পাউণ্ডার, হোমিওপ্যাথ আর কবরেজদের সঙ্গে। মাদুলি, কবচ, ওলাবিবি সকলের সঙ্গে আপস করে চলতে হবে। সামনে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে লোকে লাথাবে, অপমান করবে, তুমি টুঁ শব্দটি করতে পাবে না। দেখলাম, এ রকম স্বাধীন ব্যবসা করা আমার পোষাবে না। সুট সুট করে গিয়ে চাকরি নিলুম। সারাজীবন চাকরিই করেছি। চাকরিতেও খানিকটা গ্লানি ছিল বটে, কিন্তু একটি মনিবকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে আর কোন ঝঞ্ঝাট ছিল না, আর সে মনিবটি সাধারণত শিক্ষিত সাহেব হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুণের কদর করত তারা। চাকরি করে খানিকটা স্বাধীনতা ভোগ করেছিলুম। রামা শামা যদুর পায়ে তেল দিয়ে অন্নসংস্থান করতে হয়নি, কিম্বা উনুনে হাঁড়ি চড়িয়ে রুগী ধরতে বেরুতে হয়নি। আপনিও আমাকে চাকরি অফার করেছেন। কিন্তু আমি যাদের অধীনে এতকাল চাকরি করেছি তাদের রাজত্বে সূর্য অস্ত যেত না, তাদের

সভ্যতা, সাহিত্য, তাদের শৌর্য বীর্য, রাজনীতির দাপটে সমস্ত পৃথিবী অভিভূত, তাদের কলমের এক খোঁচায় অসম্ভব সম্ভব হত—সুতরাং আমারও মেজাজটা অনেকটা সেই রকম হয়ে গেছে। আপনার অধীনে আপনার চা-বাগানে বা কোলিয়ারিতে চাকরি করা আমার পোষাবে না। তাছাড়া আপনার চাকরিটি আসলে একটি টোপ, আমি যদি মাছ হতুম, গিলে ফেলতুম, কিন্তু আমি মাছ নই—মানুষ, তাই একটু মুচকি হেসে এড়িয়ে গেলুম। নমস্কার জানবেন।"

চিঠিটা অগ্নীশ্বরের ভাই-ই আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে—বোধ হয় মাস তিনেক পরে—একদিন সকালে একটি ফুটফুটে সুন্দরী বধূ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। অগ্নীশ্বর তাহাকে পূর্বে কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া মনে পড়িল না।

"কে তুমি, তোমাকে চিনতে পারছি না।"

"আমি কমলা।"

অগ্নীশ্বর নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন মেয়েটির দিকে। লক্ষ্য করিলেন, মেয়েটির চোখের কোণে জল টলমল করিতেছে। তাঁহার চোখেও হঠাৎ জল আসিয়া পড়িল। কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না।

কমলা বলিল, "বাবা, আপনি এত কষ্ট করে এখানে আছেন, আমার কাছে চলুন, আপনাকে নিতে এসেছি।"

"সে তো অসম্ভব।"

"আমরা এখানে আসব ?"

"আসতে পার। কিন্তু একটি শর্তে। যদি তোমার বাবার ওই ত্রিশ হাজার টাকা, মোটর গাড়ি আর বাড়ি ফেরত দাও।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মেয়েটি বলিল, "আমাদের তা্রে

চলবে কি করে? উনি কোথাও চাকরি পাননি, পাবার আশাও তো কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না।"

"আমি যা পেনশন পাই তাইতে কুলিয়ে নিতে হবে। তোমার সঙ্গে বিয়ে না হলে সিধুকে এই পেনশনের উপরই নির্ভর করতে হত।"

মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আচ্ছা, বেশ আসব—"

সত্যসত্যই তাহারা টাকা গাড়ি বাড়ি ফেরত দিয়া অগ্নীশ্বরের স্যাঁতসেঁতে একতলা বাসায় আসিয়া উঠিল একদিন। বাড়িটিতে দুইখানি মাত্র ঘর ছিল, একটিতে অগ্নীশ্বর শয়ন করিতেন, অপরটি ছিল তাঁহার বাথরুম। নিজে তিনি বাথরুমে গিয়া খাটিয়া পাতিলেন, ছেলে বউকে ছাড়িয়া দিলেন নিজের শুইবার ঘরটি। তাঁহার মেয়েদের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। সিদ্ধেশ্বরই তাঁহার একমাত্র পুত্র। সুতরাং খুব বড় বাড়ির দরকারও ছিল না তাঁহার। কিন্তু কিছুদিন সে বাড়িতে বাস করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন কমলার খুব কষ্ট হইতেছে। কমলা তাঁহার সেবা করিবার জন্য সর্বদা ব্যস্ত। রাঁধিবার চাকরটি আসিয়াই সে ছাড়াইয়া দিল। নিজে হাতে সমস্ত করিত, এমনকি, অগ্নীশ্বরের 'স্পিটপট' পরিষ্কার করা পর্যন্ত। অগ্নীশ্বরের অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম হইত না, তিনি শুইয়া শুইয়া বই পড়িতেন। ঠিক পাশের ঘরটিই কমলা আর সিদ্ধেশ্বরের, অগ্নীশ্বর উৎকর্ণ হইয়া থাকিতেন, যদি তাহাদের হাসির গিটকিরি বা গল্পের টুকরা তাঁহার কানে ভাসিয়া আসে। কিন্তু কিছুই আসিত না, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত না। হঠাৎ একদিন তাঁহার মনে হইল—'ওটাতে কারা শুয়ে আছে? নতুন-বিয়ে-করা বউ-ছেলে, না, দুটো মড়া! আমার ভয়ে ওইরকম করছে না কি—।'

তাহার পরদিন হইতে তিনি সকাল সকাল আলো নিভাইয়া

দিতেন। ঘুম আসিত না, বিনিদ্র নয়নে চুপ করিয়া জাগিয়া থাকিতেন। দিন দুই পরেই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার 'ডায়াগ্‌নোসিস্‌' ঠিক। তাঁহার ভয়েই উহারা চুপ করিয়া থাকে। দুইটি ঘরের মাঝখানে যে পার্টিশন ছিল, তাহা ছাত পর্যন্ত ছিল না। সেই ফাঁক দিয়া পুত্র-পুত্রবধূর বিশ্রম্ভালাপ তিনি দিন কয়েক শুনিলেন, সম্ভবত উপভোগও করিলেন।

একদিন সকালে উঠিয়া কিন্তু দেখা গেল তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন। সিদ্ধেশ্বরকে তিনি যে পত্রটি লিখিয়া গিয়াছেন তাহা এই—

সিধু,

আমি তোমাদের মুক্তি দিয়ে গেলুম। নিজেকেও মুক্ত করলুম। তোমাদের সঙ্গে বাস করতে হলে যে অনভ্যস্ত সংযমের কারাগারে বন্দী হয়ে থাকতে হবে সে কারাগারে বাস করা এ বয়সে আমার পক্ষে অসম্ভব। রাত্রি একটা দেড়টা পর্যন্ত বই না পড়লে আমার ঘুম হয় না, অথচ পাশের ঘরে আলো জ্বেলে বই পড়লে তোমাদের প্রেমালাপ জমে না। সামান্য চারটি আলো চালের ভাত, একটু মুগের ডাল, গাওয়া ঘি, দু'একটা ভাজাভুজি এই খেয়ে আমি তৃপ্তি পাই। কিন্তু তোমার কমলা যখন সেবা করবার আতিশয্যে মশলা-গরগরে তরকারি তৈরি করে আনে, তখন সোনামুখ করে সেটা খেতে হয়, খেয়ে বাহবাও দিতে হয়, না দিলে অভদ্রতা হয় সেটা। রান্না যে খারাপ হয় তাও নয়, কিন্তু ও-ধরণের রান্না খেয়ে আমার তৃপ্তি হয় না। আমার নিজের রুচির কথা ওকে বলতে ভয় পাই, কারণ ও একা-হাতে আবার সব করতে যাবে আমাকে খুশি করবার জন্য। তোমরা মশলা-গরগরে রান্না পছন্দ কর, হজমও করতে পার, আমিও এককালে পারতুম, এখন আর পারি না, ভালও লাগে না। তোমার কমলা নাকি-সুরে যে আধুনিক গান গায়, তা একেবারে

ভালো লাগে না আমার, আমার কান যে গান শুনতে অভ্যস্ত, তা ওস্তাদী গান, আধুনিক গান শুনলে মনে হয়, কতকগুলো উইচিংড়ে ফড়িং জাতীয় পোকা তাদের antics দেখাচ্ছে লাফালাফি কোরে। আমার এই ব্যক্তিগত অ্যাকোয়ার্ড রুচিকে বদলাতে পারি না, জোর করে তোমাদের উপর চাপাতেও পারি না। কিন্তু রেডিওতে যখন ভালো কানাড়ার আলাপ হচ্ছে, তখন সেটা কঁ্যাক করে বন্ধ করে তোমরা যখন অমুকবালা বা তমুকনাথের সিনেমার গান শোন, তখন আমার সর্বাঙ্গ রিরি করতে থাকে, অথচ মুখের হাসিটি ফুটিয়ে রেখে পা দুলিয়ে দুলিয়ে তাল দিতে হয়। হিটলার না মুসোলিনী, কে যেন তাদের পলিটিকাল প্রিজনারদের শাস্তি দেবার জন্যে এই ধরণের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু এ আমার আর সহ্য হল না, তাই পালাচ্ছি। নিজের ব্যক্তিত্বের শূলে চড়িয়ে একটি নারীকে তো হত্যা করেছি, আর করবার ইচ্ছা নেই। কমলা ভালো মেয়ে, আশা করি ওকে নিয়ে তুমি সুখে ঘর-করনা করতে পারবে। নিজের জন্যে পঞ্চাশ টাকা রেখে আমার পেনশনের বাকি টাকাটা তোমাকে প্রতিমাসে পাঠিয়ে দেব। আমি একটা নামজাদা দাতব্য চিকিৎসালয়ের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করছিলাম। কয়েকদিন আগে তাঁরা জানিয়েছেন যে, আমাকে তাঁরা 'অনাহারী' সার্জনের পদে বাহাল করতে রাজী আছেন। মাসে শতখানেক টাকা অ্যালাউন্স হিসেবে দেবেন, থাকবার বাড়ী দেবেন, চাকরও দেবেন একটা। এর সঙ্গে পেনশনের পঞ্চাশ টাকা যোগ দিলে আমার ভালই চলে যাবে। সেখান থেকে আমাকে যেন আর টানাটানি করে আনবার চেষ্টা করো না। বাইরে থাকলেই আমি সুখে থাকব এবং আমার ভয়ঙ্কর ব্যক্তিত্বের আঁচটা সরে গেলে তোমরাও সুখে থাকবে আশা করি। ইতি—

যে আলেয়ার পিছনে তিনি সারাজীবন ছুটাছুটি করিয়াছেন, সে আলেয়া তাঁহাকে কিসের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহাই আমি বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। ধন মান্ ধর্ম মোক্ষ এসব কিছুই তিনি চাহেন নাই। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, তিনি সম্ভবত স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন—সেই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা, যাহা সামাজিক মানুষের পক্ষে দুলভ।

আপনাদের অনেকের মনে এ প্রশ্ন হয়তো জাগিতেছে যে, আমি একজন পুলিশ অফিসার, অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়কে লইয়া আমি এত মাথা ঘামাইতেছি কেন। ঘামাইতেছি, কারণ, আমার এই মাথাটা তিনিই একদিন রক্ষা করিয়াছিলেন।

সেই কথাটাই এবার বলিব। পূর্বে একটু আভাসমাত্র দিয়াছি এইবার খুলিয়া বলিব। বোমার দলে কেন যোগ দিয়াছিলাম, কবে যোগ দিয়াছিলাম, তাহা এ কাহিনীর পক্ষে অবান্তর। সে যুগে যে উন্মাদনা বাংলার আকাশে বাতাসে সঞ্চরণ করিতেছিল, সে উন্মাদনার প্রভাব আমিও এড়াইতে পারি নাই। আমি যে-দলে ছিলাম, সে-দলের কাজ ছিল নানা স্থানে স্বদেশী ডাকাতি করা এবং সেই ডাকাতির টাকা দিয়া বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করা। বহুকাল পূর্বে অনুষ্ঠিত বাহ্রা ডাকাতিই ছিল আমাদের আদর্শ। ডাকাতি করার ফাঁকে ফাঁকে সাহেব অথবা গোয়েন্দা মারিবার চেষ্টা। ইহাই ছিল মোটামুটি আমাদের কার্যক্রম। কিন্তু হায়, একদিন ধরা পড়িলাম। আমাদেরই দলের একজন বিশ্বাসঘাতকতা করিল। বাঙালীদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমিক কম ছিল না, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকও অনেক ছিল। মানবসভ্যতা যেমন কৃষিসভ্যতা ও যাযাবর সভ্যতায় ভাগ হইয়া দুইটি বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি করিয়াছে, বাঙালী সমাজও যেন অনেকটা তাই। একদল চাকরিবিলাসী শান্তশিষ্ট সুবিধাবাদী কেরানীর দল। বড় সাহেবের মন রাখিয়া, গৃহিণীর গহনা গড়াইয়া, বংশ বৃদ্ধি, দোল-দুর্গোৎসব, পুত্রকন্যার বিবাহ প্রভৃতি নিষ্পন্ন করিয়া জীবনের অপরাহ্নে পরচর্চা, পরলোক-চর্চা, দলাদলি, ঘোঁট প্রভৃতিতে মত্ত থাকিয়া হরিনাম করিতে করিতে

শেষ নিশ্বাসটি ত্যাগ করা—ইহাই মোটামুটি তাঁহাদের জীবনের আদর্শ। কিন্তু এই বাঙালীর ঘরেই আবার এমন একদল ছেলে-মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, গৃহের বন্ধন, গৃহস্থালীর মায়া যাহাদের বাঁধিতে পারে নাই, আদর্শের স্বপ্নে বিভোর হইয়া যাহারা যুগে যুগে গৃহত্যাগ করিয়াছে। এই দলে চৈতন্য ছিলেন, ক্ষুদিরাম, কানাইলালেরাও এই দলের লোক। ইহাদের সহিত প্রথমোক্ত দলের ঘোর শত্রুতা। কারণ, ইহাদের নিঃস্বার্থ আত্মবিসর্জনের আগুন, ইহাদের ভূমাকাঙ্ক্ষী প্রাণের প্রচণ্ড ঝড়, গৃহস্থের সুখের সংসারকে বারবার শ্মশান করিয়া দিয়াছে। তাই যখনই এইরূপ ত্যাগী আদর্শ-পাগল লোক সমাজে দেখা দিয়াছে, তখনই তাহাদের বিরোধিতা করিবার লোকও দেখা দিয়াছে সংরক্ষণশীল সমাজ হইতে। সংখ্যায় বাঙালী বিপ্লবী এবং বাঙালী গোয়েন্দা প্রায় সমান।

দলের একজনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আমরা ধরা পড়িয়া একটি মফঃস্বলের জেলে বন্দী হইলাম। আমাদের বিরুদ্ধে চার্জ—সশস্ত্র ডাকাতি এবং হত্যার। কোনোটাই মিথ্যা নয়। ফাঁসি সুনিশ্চিত। মৃত্যুরই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। এমন সময় বিধাতা দয়া করিলেন। আমাদের দলের লোক জেলের চাকরদের হাত করিয়া আমাদের কাছে গোটা দুই লোডেড রিভলবার পৌঁছাইয়া দিল। যে পাত্রে করিয়া মেথররা প্রতি 'সেল' হইতে বিষ্ঠা পরিষ্কার করে, সেই পাত্রের মধ্যে বিষ্ঠার স্তূপে আত্মগোপন করিয়া আমাদের উদ্ধারকর্তারা আসিলেন। নরেন গোঁসাইকে খুন করিবার জন্য কানাইলালের নিকটও একদা তিনি আসিয়াছিলেন। আমরা আর কালবিলম্ব করিলাম না, দুইজন ওয়ার্ডারকে হত্যা করিয়া পরদিনই জেল হইতে পলায়ন করিলাম। জেলেরই চাকররা আমাদের সহায়তা করিয়াছিল। তাহা না করিলে পারিতাম না। সেকালে

জেলের অনেক চাকরেরা স্বদেশীদের মনে মনে ভক্তি করিত। অনেকে বাহির হইতে টাকাও পাইত প্রচুর।

পাগলা ঘণ্টা যখন বাজিয়া উঠিল, তখন আমরা জেলের বাহিরে। প্রাণপণে ছুটিতেছি। আমাদের তাড়া করিয়াছে রাইফেলধারী মিলিটারী পুলিশ। ঘোড়ায়, মোটরে, পদব্রজে। অধিকাংশই লালমুখ টমি। জেলের নিকটেই তাহাদের একটা ছাউনি ছিল।

কতক্ষণ ছুটিয়াছিলাম মনে নাই, হঠাৎ একটা গুলি খাইয়া পড়িয়া গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ধরাও পড়িলাম।

...যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখি হাসপাতালের একটা বিছানায় শুইয়া আছি। ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায় আমার ক্ষতটা পরীক্ষা করিতেছেন। কাছেই একজন টমি দাঁড়াইয়া আছে। কথাবার্তায় মনে হইল, সেই ক্যাপ্টেন। অগ্নীশ্বর বলিলেন, "এর পেটে বুলেট ঢুকেছে। সেটা বার করে না দিলে বাঁচবার আশা নেই। তোমরা কি একে বাঁচাতে চাও?"

"নিশ্চয়—"

"তাহলে এখুনি অপারেশন করতে হবে। আমি কিন্তু আমার আপিসে তোমাদের ডিনারের ব্যবস্থা করেছি। দু বোতল হুইস্কিও পেয়েছি। তুমি আগে ডিনার খাবে, না, আমার সঙ্গে অপারেশন থিয়েটারে যাবে—"

"আমি অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে কি করব? ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে আমার, আমি খাই গিয়ে। আই হোপ, আই ক্যান ট্রাস্ট্ ইউ, ইউ আর মাই ওল্ড্ ফ্রেণ্ড্।"

"অফ কোর্স—"

সাহেব ডিনার খাইতে চলিয়া গেলেন। অগ্নীশ্বর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেলেন অন্য একটা দরজা দিয়া। তিনি কি করিলেন জানি না, একটু পরে দুইজন বেয়ারা একটি স্ট্রেচার লইয়া আসিল।

স্ট্রেচারে চড়িয়া আমি যে ঘরে উপস্থিত হইলাম, তাহা অপারেশন থিয়েটার নয়, মর্গ। অগ্নীশ্বর সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি মেথর দুইজনকে বলিলেন, যে আনক্লেমড্ বডিটা এখানে রয়েছে, সেইটা তুলে নিয়ে যা অপারেশন থিয়েটারে। তুমি শিগ্গির নাব—"

স্ট্রেচার হইতে আমাকে নামাইয়া দিয়া আমার কানে কানে বলিলেন, "তোমাকে আমি চিনেছি। তুমি পালাও—"

স্ট্রেচারবাহিত হইয়া আনক্লেমড্ মৃতদেহটি অপারেশন থিয়েটারের দিকে চলিয়া গেল। আমি অজানার উদ্দেশ্যে আবার অন্ধকারে পা বাড়াইলাম। বুলেট আমার পেটে প্রবেশ করে নাই, পেটের চামড়া ঘেষিয়া চলিয়া গিয়াছিল, খানিকটা চামড়া তুলিয়া লইয়াছিল, আর কিছু করিতে পারে নাই। কয়েকদিন পরে কাগজে দেখিলাম, হাসপাতালে আমার মৃত্যু হইয়াছে। পেটে বুলেট ঢুকিয়াছিল, -তাহা বাহির করিবার জন্য আমার পেট কাটা হয়। সার্জন এ. মুখার্জি অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও বুলেটটি পান নাই। অপারেশনের ফলে আমার মৃত্যু হইয়াছে।

...কিছুদিন পরে দাড়ি, লুঙ্গী আর চাটগাঁয়ের ভাষার সাহায্যে ভোল বদলাইয়া ফেলিলাম। তখন মুসলমানদের উপর ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট খুব প্রসন্ন ছিলেন, তাই মুসলমানের ছদ্মবেশ গ্রহণ করাই নিরাপদ মনে হইল। চট্টগ্রামের এক মুসলমানের বাড়িতেই চাকর হিসাবে বাহাল হইয়া গেলাম। পরিচয় দিবার সময় বলিলাম, কলিকাতায় আমার বাবা বাবুর্চির কাজ করিত, হিন্দু-মোসলেম রায়টের সময় হিন্দুর ছুরিতে মারা গিয়াছে, মা কোথায় পলাইয়া গিয়াছে জানি না। ভাই বোন কেহ নাই।

হায়রে, আমার নিজের বাবা মা তখন হয়তো তাঁহাদের শহীদ পুত্রের মৃত্যুশোকে ভালো করিয়া কাঁদিতেও পারিতেছেন না, কারণ

আমার আর একটি ভাই ছিল, সে যে আমার ভাই, একথা পুলিশের কানে গেলে তাহাকেও লইয়া পুলিশ টানাটানি করিবে, এই ভয়ে তাঁহাদের পুত্রশোকও হয়তো ভাষা পাইতেছে না, এই রকম একটা কল্পনা করিয়া আমি সুখ পাইতাম। কিন্তু সত্য যাহা ঘটিয়াছিল তাহা আরও নিদারুণ। আমার বাবা মা ভাই কেহই রক্ষা পায় নাই। আমার বাবা মা পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতেন, যে বিশ্বাসঘাতক আমাদের ধরাইয়া দিয়াছিল, আমার ভাই তাহাকে প্রকাশ্য রাজপথে কুকুরের মতো হত্যা করিয়া ফাঁসি গিয়াছে। পুলিশের লোকেরা আমার মা বাবাকেও রেহাই দেয় নাই। আমি যখন বিলাত হইতে ফিরিলাম, তখন তাঁহাদের স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত। আমাদের ভিটায় ঘুঘু চরিতেছে না, রাজানুগৃহীত এক ব্যক্তি সেখানে বাড়ি করিয়াছেন, তাঁহার অ্যালশেসিয়ান কুকুরের দাপটে সেখানে কেহ ঘেঁষিতে পারে না। আমি বাবা মায়ের শ্রাদ্ধ তর্পণও করিয়াছি লুকাইয়া। সহজে তাহা সম্ভব হয় নাই। বাংলা-বিহার-উত্তর প্রদেশে আমি মুসলমান বলিয়া পরিচিত, প্রকাশ্যে হিন্দুমতে বাবা মার শ্রাদ্ধ করিব কি করিয়া? তবু করিয়াছিলাম। ধনুষ্কোটি যাইতে হইয়াছিল।

হ্যাঁ, আমি শেষ পর্যন্ত বিলাত গিয়াছিলাম। ব্যাপারটি সম্ভব হইয়াছিল বড় অদ্ভুত উপায়ে। আমি যে হাজি সাহেবের বাড়িতে চাকররূপে বাহাল হইয়াছিলাম তাঁহার বৃহৎ পরিবার। তাঁহার নিজেরই চারটি বিবি। দুইটি বয়স্ক পুত্রও পিতৃ-পন্থা অনুসরণ করিয়া একাধিক বিবাহ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, একটি কন্যা এবং একটি ভাগ্নী সপরিবারে তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিতেন। বৃহৎ পরিবার। আমাকে বাসন মাজিতে হইত, বাহিরের ঘর ঝাড়ু দিতে হইত, পুরুষদের কাপড় কাচিতে হইত ইহা ছাড়া ফাই-ফরমাস তো ছিলই। বাজারও করিতে হইত। বাজার করিতে

গিয়া লক্ষ্য করিতাম, একটি ভিখারিণী প্রায় প্রতি দোকানেই গিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে। কেহ ভিক্ষা দিতেছে, কেহ দিতেছে না, কিন্তু সকলেরই দৃষ্টি প্রলুব্ধ। মেয়েটির বয়স আন্দাজ ত্রিশ বত্রিশ হইবে। যুবতী নয়, কিন্তু রূপসী। তাহার চোখের দৃষ্টি ঠিক পণ্য-রমণীর দৃষ্টি নহে। কিন্তু অদ্ভুত সে দৃষ্টি। তাহার ভাষাও চট্টগ্রামের ভাষা নহে, পশ্চিমবঙ্গের ভাষা। মনে হইল মেদিনীপুরের। মেদিনীপুর বিপ্লবীদের চক্ষে তীর্থস্থান। মেয়েটির কথায় মেদিনীপুরের টান শুনিয়াই প্রথমে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তাহার পর একদিন সে আমার কাছেও ভিক্ষা চাহিল।

বলিলাম, "আমি তো নিজেই গরীব। তোমাকে আর কি দিতে পারি।"

"যা পার তাই দাও—"

আরও দিন দুই পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভিক্ষা কর কেন। রোজকার করতে পার না?"

মেয়েটি তাহার সেই অদ্ভুত দৃষ্টি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিল। তাহার পর বলিল, "আমার মতো মেয়ের পক্ষে রোজ-কারের একটি পথই খোলা আছে। অনেকেই আমাকে সে চাকরি দিতে চায়। কিন্তু আমার প্রবৃত্তি হয় না।"

তাহার চোখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মনে হইল, চোখের দুটি তারা যেন দুটি ছর্‌রা। সহসা সে বলিয়া উঠিল, "তুমি আমার ছেলে হবে? আমাকে মা বলে ডাকবে? আমাকে কেবল খেতে পরতে দিও, তোমার সব কাজ আমি করে দেব—"

"আমি যে মুসলমান মা, আমার ছোঁয়া খাবে তুমি?"

"তুমি যদি মা বলে আমাকে ডাক, তাহলে তো জাতের বিচার আর রইলো না। মায়ের চোখে সব ছেলেই এক জাত।"

"বেশ, তাই হবে। তোমার দেশ কোথা?"

"মেদিনীপুর জেলা, কণ্টাই সাবডিভিসন।"

শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

"এখানে কি করে এলে।"

"ভাসতে ভাসতে। এক স্বদেশী আন্দোলনে সায়েবরা এসে পেট্রোল দিয়ে আমাদের ঘর-বাড়ী সব পুড়িয়ে দিলে। আমার স্বামীর মুখের উপর গুলি করলে একজন সাহেব। তার অপরাধটি কি জান? সে বলেছিল, 'বন্দে মাতরম্'। আমার ছেলেটাকেও মেরে ফেললে। মারলে না কেবল আমাকে।"

তাহার চোখের ছর্‌রা দুইটি প্রখর হইয়া উঠিল। মনে হইল, এখনি বুঝি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিবে।

"আমাকে তারা ফেলে চলে আসছিল। কিন্তু আমি সঙ্গ ছাড়িনি। খবর পেয়েছি, ওরা এখানে এসেছে। তাই আমিও এসেছি—"

"ওদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছ কেন—"

"এখনও বকশিস পাইনি যে"।

কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল সহসা।

"তুমি ছেলে বলেই তোমাকে সব কথা বললুম। বলা বোধ হয় উচিত ছিল না, না? মাথার ঠিক নেই। তুমি আমাকে মা বলে ডাকবে তো? একবেলা দুটি খেতে দিও কেবল, কেমন? কোথা থাক তুমি।"

"হাজি সাহেবের বাড়িতে। সেখানে যেও না যেন। আমি তোমার খাবার এইখানেই নিয়ে আসব। তুমি কোথায় থাক?"

"কোথাও না। দিনরাত ঘুরি। ফাঁক খুঁজি। শোবার বসবার কি জো আছে কোথাও, সঙ্গে সঙ্গে কেউ না কেউ দাঁড়াবে কাছে এসে। খালি ঘুরে বেড়াই। সকালবেলা বাজারে আসি। এইখানেই খাবার দিয়ে যেও, কেমন?"

অভিভূত হইয়া বাড়ি ফিরিলাম।

তাহার পরদিন হইতে রোজই আমার খাবারের খানিকটা অংশ তাহাকে দিয়া আসিতাম। ও অঞ্চলে সকলে তাহাকে পাগলী বলিত। প্রথম প্রথম অনেকে তাহাকে বিরক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, শেষে আর করিত না। সে একজনকে নাকি কামড়াইয়া দিয়াছিল।

এইভাবেই চলিতেছিল। ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল। একদিন নদীতে স্নান করিতেছি, হঠাৎ সকলে হৈ হৈ করিয়া উঠিল। দেখিলাম একটি ছেলে ডুবিতেছে। ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। বাঁচিবার আশা প্রায় নাই। প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলাম এবং অনেক কষ্টে ছেলেটার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিতে টানিতে তাহাকে তীরে তুলিলাম। অনেক জল খাইয়াছিল, হাসপাতালে গিয়া কোনরকমে রক্ষা পাইয়া গেল। শুনিলাম একজন সারেং-এর ছেলে। সারেং একদিন আসিয়া আমার সহিত দেখা করিলেন এবং আমাকে কিছু পুরস্কার দিতে চাহিলেন। পুরস্কার লইলাম না। বলিলাম, "আপনার ছেলের 'জান' বাঁচাতে পেরেছি এই তো আমার যথেষ্ট বকশিস। খোদাতালা ওকে বাঁচিয়ে রাখুন, এর জন্যে আমি টাকা নিতে পারব না। গোস্তাকি মাপ করবেন।"

দিনকতক পরেই কিন্তু বকশিসটা লইতে হইল অপ্রত্যাশিত-রূপে এবং অন্য প্রকারে। একদিন বাজারে সেই পাগলীটা বলিল, "তুই যে আমাকে মা বলিস, পেন্নাম করলি না তো একদিন। পেন্নাম কর আজ—"

ভঙ্গীভরে শাড়িটা তুলিয়া পা বাড়াইয়া দিল। দেখিলাম, তাহার মুখে অদ্ভুত একটা হাসি, চোখের কোণে জল।

"পেন্নাম কর। মাকে পেন্নাম করবি তাতে আর লজ্জা কি—"

চারিদিকে লোক জড় হইয়া গিয়াছিল। আমি সত্যই একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলাম। শেষে তাহার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্যই তাহাকে একটা প্রণাম করিলাম। সে একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। সহসা তাঁহার চিবুক ও নীচের ঠোঁটটা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিল—"মানুষের মতো মানুষ হও। আমি আশীর্বাদ করছি তুমি হবে।"

মেয়েটির নাম ছিল বিশাখা। বাঁ হাতে উলকি দিয়া নামটি লেখা ছিল। সে আজ কত দিনের কথা। তাহার হাসি-কান্না মাখা মুখখানি আজও আমার মনে স্পষ্ট আঁকা আছে। এতটুকু ম্লান হয় নাই। মাঝে মাঝে মনে হয়, তাহার আশীর্বাদ কি আমার জীবনে ফলিয়াছে? সত্যই কি মানুষের মতো মানুষ হইতে পারিয়াছি?

প্রণাম করার পরদিনই ঘটনাটি ঘটিল। একজন মিলিটারি সাহেব বাজারে আসিয়াছিল, বিশাখা ছুটিয়া গিয়া একেবারে তাহার টুঁটি কামড়াইয়া ধরিল। সে কামড় সাংঘাতিক মরণ কামড়। বুলডগ যেমন একবার কামড়াইয়া ধরিলে সে কামড় আর খোলে না, এ কামড় তেমনি কামড়। অনেক টানাটানি ধস্তাধস্তি করিয়াও বিশাখাকে ছাড়ানো গেল না। তাহার পিঠের উপর লাঠি জুতা ঘুষি চড় বর্ষিত হইতে লাগিল, তবু সে ছাড়িল না। শেষে একজন সার্জেণ্ট তাহার কাপড় খুলিয়া সর্বাঙ্গে শপাশপ হাণ্টার চালাইতে লাগিল। তবু কোন ফল হইল না। শেষে তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হইল। বিশাখা মরিল, কিন্তু তাহার মৃতদেহটা সাহেবের টুঁটি কামড়াইয়া ঝুলিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করিয়া তাহার রক্তাক্ত মুখটা সাহেবের গলা হইতে যখন ছাড়াইয়া লওয়া হইল, তখন দেখা গেল, সাহেবের

টুঁটিটা সে একেবারে চিবাইয়া দিয়াছে, একাধিক বড় বড় শিরাও ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। আধঘণ্টা পরে সাহেবেরও মৃত্যু হইল।

বাংলার অগ্নিযুগের ইতিহাসে বিশাখার নাম লেখা নাই। আরও অনেকের নাই। ইচ্ছা করিয়া অনেকে নিজেদের পরিচয় মুছিয়া দিয়া গিয়াছে। কাজটাই তাহাদের কাছে বড় ছিল, নামটা নয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে আমাদের সেই পলাতক জীবনে যখন বন্যপশুর মতো আমরা একস্থান হইতে আর একস্থানে পলাইয়া বেড়াইতাম, যখন পথের বদলে বিপথ এবং গৃহের বদলে অরণ্যই আমাদের নিকট বেশি নিরাপদ মনে হইত, যখন ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, বিশ্রামের শয্যা দুর্লভ বিলাসের মতো ছিল, সেই সময় কত অপরিচিত গৃহে আশ্রয় পাইয়াছি, কত অচেনা মা-বোনেদের সেবা পাইয়াছি, তাহার ইতিহাসও কোথাও লেখা থাকিবে না। তাঁহারা জানিতেন আমরা বোমার দলের লোক, তাঁহারা জানিতেন আমাদের আশ্রয় দেওয়া নিরাপদ নয়, তবু আশ্রয় দিতেন, হয়তো একঘণ্টার জন্য, হয়তো এক রাত্রির জন্য, আজ কোথায় তাঁহারা, ইতিহাসে তাঁহাদের নাম নাই। বিশাখারও নাই। মাঝে মাঝে মনে হয়, জীবন আমার ধন্য হইয়া গিয়াছে। তাহাকে একবারও অন্তত প্রণাম করিয়াছি।

বিশাখা মরিয়া কিন্তু আমাকে বিপদে ফেলিয়া গেল। পুলিশের খবর পাইতে বিলম্ব হইল না যে, আমি তাহাকে রোজ খাইতে দিতাম। বাজারে যাইতেই একজন আমাকে বলিল, "তুমি শিগ্‌গির এখান থেকে পালাও। পুলিশ তোমাকে খুঁজছে—"

বাজার না করিয়াই বাড়ি ফিরিয়া গেলাম। হাজি সাহেবকে খুলিয়া বলিলাম সব। তিনি বলিলেন, "পুলিশ তোমার খোঁজে এখানেও এসেছিল, আমি বলে দিয়েছি, তুমি এখানে নেই। তোমাকে আমি জবাব দিয়েছি। তুমি এদেশ ছেড়ে পালাও।"

"কোথা পালাব হুজুর। আমি গরীব মানুষ—"

হাজি সাহেব গম্ভীরমুখে দাড়ির ভিতর আঙুল চালাইতে লাগিলেন।

"কিন্তু আমি তো বাপু তোমাকে আর আমার বাড়িতে থাকতে দিতে পারি না। তুমি তাহলে এক কাজ কর, সারেং সাহেবের কাছে যাও। তাঁর জাহাজ দু'একদিনের মধ্যেই ছাড়বে। তিনি যদি তোমাকে জাহাজে তুলে নিয়ে কোথাও পার করে দেন, তাহলে বেঁচে যাবে তুমি এ যাত্রা—"

"কোন সারেং—"

"আরে, যার ছেলেকে তুমি বাঁচিয়েছিলে—"

সারেং বলিল, "নিশ্চয়, তোমার জান বাঁচাব বইকি। তুমি আমার আলীকে বাঁচিয়েছ। আমার জাহাজ বিলেত যাবে। যেতে রাজী আছ তো? জাহাজের খোলের ভিতর লুকিয়ে থাকতে হবে কিন্তু।"

"আপনি যা করতে বলবেন, তাই করব। খোলের ভিতর কতদিন থাকতে হবে?"

"বেশিদিন হয়তো না-ও হতে পারে। কাপ্তেন সাহেবকে বলব, আমি একটা চাকর সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, তিনি হয়তো আপত্তি করবেন না।"

কাপ্তেন সাহেব আপত্তি করিলেন না। শুধু তাহাই নয়, দিন-কয়েক পরে আমি কাপ্তেন সাহেবেরই প্রিয় ভৃত্য হইয়া পড়িলাম। তিনি মদটা একটু অধিক মাত্রায় খাইতেন এবং মত্ত অবস্থায় আমাকে গালাগালি দিয়া সুখ পাইতেন। এটা বোধহয় তাঁহার চাটের কাজ করিত। দুই এক পেগ পেটে পড়িবামাত্র তিনি আমাকে সন্ অব্ এ বিচ বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং ধাপে

ধাপে গালাগালি যে ভাষায় গিয়া শেষ পর্যন্ত পৌঁছিত তাহা লেখা যায় না। আমার কাজ ছিল সোডার বোতল খোলা, মদের বোতল খোলা, বরফ ভাঙা, গালাগালি শোনা এবং তিনি যখন বে-এক্তার হইয়া পড়িতেন, তখন তাঁহাকে লইয়া গিয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দেওয়া। মাঝে মাঝে তিনি আমাকে লাথিও মারিতেন। সবই আমি নির্বিকারভাবে সহ্য করিতাম। অভিনয় ভালই করিতেছিলাম। যে কোনও অবস্থার সঙ্গে নিজেকে বেমালুম খাপ খাওয়াইয়া লইবার শিক্ষা বিপ্লবী জীবনেই লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু বিপ্লবী জীবনে বাহিরে যেভাবেই আত্মপ্রকাশ করি না কেন, ভিতরে ভিতরে স্বকার্যসাধনের লক্ষ্য ঠিক থাকিত। এক্ষেত্রে তাহা ছিল না। তাই মনে মনে একটু অস্বস্তিবোধ করিতেছিলাম। নিজের দলের লোকই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাদের ধরাইয়া দিয়াছে এই গ্লানিতে বিপ্লবীজীবনের সম্বন্ধেই আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম।,তখনও জানিতাম না যে, আমার ভাই সেই বিশ্বাসঘাতকটাকে হত্যা করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইয়াছে। জানিলে হয়তো আবার বিপ্লবী জীবনেই ফিরিয়া যাইতাম। কিন্তু তখন জানিতাম না। বিশাখার মৃত্যু মনকে নাড়া দিয়াছিল, বিশাখার মৃত্যুর জন্যই এই জাহাজে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইয়াছে, অদৃষ্ট যে কোন পথে আমাকে চালিত করিতেছে, ইহার পর কোথায় কি করিব, চিরকাল পলাতকের ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে হইবে কি না, এই সব অনিশ্চিত ভাবনায় মনটা সর্বদাই অবসন্ন হইয়া থাকিত। এমন সময় হঠাৎ একটা পথের নির্দেশ মিলিয়া গেল। জীবনে হঠাৎই এইরূপ পথের নির্দেশ মেলে। জীবনে যাহা হইয়াছি তাহা আকস্মিক যোগাযোগের ফলেই হইয়াছি। পুরুষাকার না থাকিলে অবশ্য কিছুই হয় না। কিন্তু পুরুষাকার প্রকাশ করিবার ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় এইরূপ আকস্মিক

যোগাযোগের ফলে। কোথা হইতে কে আসিয়া একটা বিশেষ পথে কেন যে লইয়া যায় তাহা কে বলিবে।

একদিন চোখে পড়িল, ডেকে বসিয়া একটি যুবক নিবিষ্টচিত্তে একখানি বই পড়িতেছে। চেহারাটা ভারতীয় তো বটেই, বাঙালী বলিয়া সন্দেহ হইল। আস্তে আস্তে পিছন দিকে গিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম কি বই পড়িতেছে। দেখিয়া বিস্মিত এবং চমকিত হইলাম। বাংলা বই, কিন্তু ছাপা নয় হাতে-লেখা। লেখাটাও আমার চেনা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল, তাহার পর সহসা মনে পড়িল। এ যে অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের হস্তাক্ষর। সুবিমলকে লেখা তাঁহার অনেক চিঠি যে আমি পড়িয়াছি। এ ভদ্রলোক কে? অগ্নীশ্বরের কোনও আত্মীয় না কি। তখন আর কিছু বলিলাম না। আস্তে আস্তে সরিয়া গেলাম। কিন্তু মনের মধ্যে একটা ঔৎসুক্য জাগিয়া রহিল। ভদ্রলোকটির পরিচয় সংগ্রহ করিতে হইবে। পরদিন ঝড়বৃষ্টি নামিল। ডেকে কেহই বাহির হইতে পারিল না। তাহার পরদিনও ভদ্রলোকটিকে পাইলাম না। তাহার পর চোখে পড়িল তিনি জাহাজের ডাক্তারবাবুটির ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছেন। একটু পরেই তাঁহার সহিত দেখা হইল। তিনি ডাক্তারবাবুর ঘর হইতে বাহির হইতেছিলেন, আমি আগাইয়া গিয়া নমস্কার করিলাম এবং বাংলায় বলিলাম, "নমস্কার, গায়ে পড়ে আলাপ করছি বলে ক্ষমা করবেন। আপনি বাঙালী, তাই আলাপ করবার লোভ সামলাতে পারলুম না।"

"আপনিও বাঙালী?"

তিনি আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। আমার পোশাকে এবং চেহারায় বাঙালীত্ব কিছু ছিল না। মুখময় দাড়ি, গোঁফ কামানো, পরনে আধময়লা পাজামা, গায়ে লম্বা নীল কোট একটা।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"মুসলমান ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"জাহাজে চাকরি করেন ?"

"হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করবার ইচ্ছে আছে। হয়তো আত্মীয়তাও বেরিয়ে পড়তে পারে—"

"আমি হিন্দু। আপনি তো মুসলমান।"

হাসিয়া বলিলাম, "হিন্দুর সঙ্গেও মুসলমানের আত্মীয়তা হয় বই কি। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি কেবল জাত বা রক্তের সম্পর্ক দিয়েই ঠিক হয় ?"

আমার মুখে এ ধরনের কথা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই।

বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "নিশ্চয় নয়। মানুষের সঙ্গে মনুষ্যত্বের সম্পর্কটাই সব চেয়ে বড়। বেশ, আসবেন, নম্বর আঠারো আমার কেবিন। যখন সুবিধে হবে আসবেন। আমি ঘরেই থাকি প্রায়।"

সেইদিনই একটু পরে অবসর মতো তাঁহার কেবিনে গিয়া দেখা করিলাম। তিনি তখনও অগ্নীশ্বরের লেখাটা পড়িতেছিলেন।

"আসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম। কোথা বাড়ি আপনার—"

হাসিয়া বলিলাম, "রবীন্দ্রাথের একটা কবিতা আছে 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া'—আমার অবস্থা অনেকটা তাই। কোথায় যে আমার বাড়ি তা জানি না। সর্বত্র সেইটেই খুঁজছি।"

সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন তিনি।

"আপনি তো গুণী লোক দেখছি মশাই। আমার সঙ্গে আপনার আত্মীয়তা আছে একথা তখন হঠাৎ মনে হল কেন—"

"আপনি যে বইটা পড়ছেন, তার হাতের লেখাটা আমার চেনা। সেদিন ডেকে বসে যখন পড়ছিলেন তখন চোখে পড়েছিল লেখাটা।"

"ও, কার লেখা বলে মনে হয়েছিল আপনার?"

"ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের।"

"ঠিক বলেছেন তো। তাঁরই লেখা আপনার সঙ্গে এঁর আলাপ কি করে হয়েছিল—"

"ছাত্রজীবনে ওঁকে প্রথম দেখি আমি। তখনই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কোলকাতায় যখন কলেজে পড়তে গেলাম, তখন ওঁর আরও পরিচয় পেলাম। আমার এক সহপাঠী সুবিমল সাহিত্যচর্চা করত, এখনও করে বোধ হয়, অগ্নীশ্বর মুকুজ্যে তার লেখার সমালোচনা করতেন। সুবিমল আমাকে দেখাতো সে সব। তখনই তাঁর ধারালো মনের পরিচয় পেয়েছিলাম। খাপখোলা তলোয়ার যেন। যদিও তখন ওঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আমার হয়নি, কিন্তু মনে হয়, পরে আমি যে পথে পা বাড়িয়েছিলাম তা ওঁরই প্রভাবে।"

আবেগের মুখে এই পর্যন্ত বলিয়া সহসা থামিয়া গেলাম। ভয় হইল, এ কি করিতেছি! অপরিচিত একটা লোকের কাছে এসব কথা বলা তো নিরাপদ নয়।

ভদ্রলোক বলিলেন,—"আমিও অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের ছাত্র। এফ-আর-সি-এস পড়ব বলে বিলেত যাচ্ছি। সত্যিই তিনি অসাধারণ লোক, অসাধারণ ডাক্তার, অসাধারণ মানুষ। বাংলা দেশে ও রকম লোক বেমানান। ওঁর কদর করবার লোক নেই আমাদের দেশে। বিদেশে জন্মালে উনি ভলটেয়ার রুশো হতে পারতেন, এদেশে ওঁর নাম পর্যন্ত জানে না কেউ।"

"ওটা ওঁর কি লেখা পড়ছেন?"

"এটা একটা অদ্ভুত লেখা। লেখাটার নাম হচ্ছে 'আধুনিক পঞ্চকন্যা।' যখন কলেজে পড়তুম, ওঁর সঙ্গে প্রায়ই আমার তর্ক

হত আমাদের ধর্ম পুরাণ নিয়ে। উনি আর্যসভ্যতার একজন গোঁড়া ভক্ত, গীতা রামায়ণ মহাভারতের অনুরাগী পাঠক এবং সমালোচক। আমি ওঁকে একটা চিঠিতে কিছুদিন আগে লিখেছিলাম যে, আমাদের দেশে যে পঞ্চকন্যাকে রোজ সকালে স্মরণ করতে বলা হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকটিই তো একাধিক পুরুষের সঙ্গে ঘর করেছেন। এঁদের স্মরণ করার মানে কি? তার উত্তরে উনি ছোটোখাটো একটা বই লিখে পাঠিয়েছেন। এটা পেয়েছি অনেকদিন আগে, কিন্তু ভালো করে পড়া হয়নি তখন। তাই সঙ্গে করে এনেছি ভালো করে পড়ব বলে। আপনি তো মুসলমান, পঞ্চকন্যার কথা জানেন না, নামই শোনেননি বোধহয়—"

হঠাৎ কেমন যেন আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। ইচ্ছা হইল বলিয়া ফেলি—গীতা আমার কণ্ঠস্থ, রামায়ণ-মহাভারত গুলিয়া খাইয়াছি, পঞ্চকন্যা আমার নিকটও দুর্বোধ্য প্রহেলিকার মতো বিস্ময়জনক। শুধু পঞ্চকন্যাই নয়, মহাভারত-রামায়ণের অনেক চরিত্রই। কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া ফেলিলাম। ভয় হইল, ভাবিলাম, 'না, এখন ধরা-ছোয়া দেওয়া ঠিক নয়'।

বলিলাম, "নাম শুনেছি বই কি। অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী এদের কথা বলছেন তো? খুবই শুনেছি। গোঁড়া হিন্দুরা হয়তো ওদের অসতী বলবেন, কিন্তু মুসলমানরা বলবে না। সের আফগানের বিবি মেহেরুন্নিসার জগদ্বিখ্যাত নূরজাহান হতে আটকায়নি—। লেখাটা আপনার পড়া হলে যদি দয়া করে দেন আমাকে, একটু পড়ে দেখব—"

"আপনার মনের চেহারার সঙ্গে বাইরের চেহারার তো মিল নেই দেখছি। এ জাহাজে আপনি কতদিন চাকরি করছেন?"

"বেশি দিন নয়। এ জাহাজ ছাড়বার সময়ই বাহাল হয়েছি—"

"কি কাজ করতে হয়।"

"ক্যাপ্টেন সাহেবের ফাইফরমাস খাটতে হয়। ওরই চাকর হয়ে যাচ্ছি—"

"আপনি এ কাজ নিয়েছেন কেন বুঝতে পারছি না। আপনার কথাবার্তা শুনে তো মনে হয় আপনি শিক্ষিত লোক। লেখাপড়া কতদূর করেছেন ?"

"বি. এসসি পাশ করেছি। দেশে কিছু জুটল না, তাই ভাগ্য-অন্বেষণ করতে বেরিয়ে পড়েছি। প্রথম এই চাকরিটাই জুটল, তাই করছি। তারপর দেখি অদৃষ্টে কি আছে—"

দুয়ারের কাছে কাহার যেন পদশব্দ পাওয়া গেল। পরমুহূর্তেই ঠক্ঠক্ করিয়া দুয়ারে টোকা পড়িল।

"মে আই কাম্ ইন্ ডক্ ?"

"ও ইয়েস।"

যিনি প্রবেশ করিলেন তাঁহাকে দেখিয়া আমার গায়ের রক্ত জল হইয়া গেল। ইনি সেই মিলিটারি ক্যাপ্টেন, যিনি আমাদের পিছনে তাড়া করিয়া আমাদের উপর গুলি চালাইয়া অবশেষে অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। ইহারই চোখে ধূলা দিয়া অগ্নীশ্বর আমাকে অপারেশন থিয়েটারে না লইয়া গিয়া মর্গে লইয়া যান এবং সেখান হইতে আমাকে ছাড়িয়া দেন। এ লোকটা এখানে আসিল কোথা হইতে। আমি ডাক্তার বাবুকে নমস্কার করিয়া অবিলম্বে বাহির হইয়া আসিলাম। বাহিরে আসিলাম বটে, কিন্তু চলিয়া গেলাম না। দরজার বাহিরে আড়ি পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

বলা বাহুল্য, আলাপ ইংরেজিতেই হইতে লাগিল।

"ডাক্তার, আমার লিভারের ব্যথাটা আবার বেশ বেড়েছে।

জাহাজের মেডিকেল অফিসার যে ওষুধটা দিয়েছে তাতে তো কিছু হচ্ছে না। তুমি কিছু বাতলাতে পার?"

"পারি। কিন্তু তাতো তুমি শুনবে না। মদটা ছাড়।"

"সে তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। কাল আধ বোতলের বেশি খাইনি তো—"

ডাক্তারবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

"কিছু বলছ না যে, কি পড়ছ তুমি ওটা। হাতের লেখা দেখছি। লাভ্ লেটার?"

"না—"

"পর্ণোগ্রাফি না কি! হাতে-লেখা কেন?"

"ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখার্জি আমার শিক্ষক ছিলেন, তিনিই লিখে পাঠিয়েছেন। খুব ভালো লেখেন।"

"ওয়েট্, ওয়েট্, আগ্নীশ্বর মুখার্জি? যিনি সিভিল সার্জন ছিলেন?"

"হ্যাঁ—"

"গ্রেট ম্যান ছিলেন তিনি। হি ওয়াজ এ নাট্"

তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, "আমাকে খুব বাঁচিয়েছিলেন একবার। একবার একাই শিকারে গেছি এক মফঃস্বলে। আমার সঙ্গে একটা ইণ্ডিয়ান বয় আমার জিনিষপত্র বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাকে একটা গাছতলায় বসিয়ে আমি তিতিরের সন্ধানে ঢুকলুম গিয়ে একটা জঙ্গলে। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেও কিছু সুবিধে হল না। ছিল অনেক তিতির, একটাও মারতে পারলুম না। ফুর্‌র ফুর্‌র করে ঝোপঝাপে ঢুকে পড়ল সব। টেম্পার খারাপ হয়ে গেল খুব। তিন-চার মাইল হাঁটতে হয়েছিল বনে-বাদাড়ে, আবার হেঁটে হেঁটে ফিরলুম। খুব ক্ষিধেও পেয়েছিল। তবে আশা ছিল, আমার কিটের ভিতর কিছু বিস্কুট আর খানিকটা পোর্ট আছে, তাই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যাবে। ফিরে গিয়ে কি দেখলুম জান?

কিট্ ব্যাগ খোলা, বিস্কুটের টিন খালি। সেই ছোঁড়া সব বিস্কুটগুলি খেয়েছে। কিট্ ব্যাগটা ঘাঁটাঘাঁটি করতে পোর্টের বোতলের ছিপিটাও ঢিলে হয়ে গিয়েছিল। পোর্টও দেখলাম পড়ে গেছে অনেকটা। লুক্ অ্যাট্ দি চীক্ অব দি বয়। জিগ্যেস করলাম, বললে, আমি কিছু জানি না। আমার আর সহ্য হল না, বুটসুদ্ধ এক লাথি ঝেড়ে দিলাম তার মাথায়। হল কি জান? ডিমের মতো মাথাটা ফেটে গেল। এটা প্রত্যাশা করিনি। এক লাথিতে মরে যাবে এ কথা ভাবাই যায় না। কিন্তু ছোঁড়া মরে গেল গায়ে হাত দিয়ে দেখি স্টোন ডেড্। কি করি, তখন এক ডুলি ভাড়া করে নিয়ে গেলাম তাকে হাসপাতালে। সেখানে তাকে ফেলে রেখে যেতে পারি না, দ্যাট্ উড্ হ্যাভ বিন্ ক্রিমিন্যাল। হাসপাতালে ছিল আগ্নীশ্বর দি গ্রেট। পুলিশে খবর দিতে হল অবশ্য। কিন্তু আগ্নীশ্বর এমন রিপোর্ট দিলে যে আমি বেঁচে গেলাম। হি ওয়াজ এ স্পোর্ট।"

একটু থামিয়া সাহেব আবার বলিলেন, "অবশ্য, আমারও পরে একটা সুযোগ এসেছিল, অগ্নীশ্বরের এ ঋণ আমি শোধ করে দিয়েছি। উই আর কুইট্স্।"

ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করিলেন, "কি হয়েছিল?"

"এখন আমি রিটায়ার করে ফিরছি, বলতে আর বাধা নেই। তবে কথাটা আর কাউকে বোলো না। আমি একবার একদল টেররিস্টকে তাড়া করেছিলাম। জেলে দুটো ওয়ার্ডারকে খুন করে পালাচ্ছিল তারা। গুলি খেয়ে পড়ে গেল কয়েকজন। তাদের ফার্স্ট-এড দেবার জন্য নিয়ে গেলাম হাসপাতালে। কাছেপিঠে ও ছাড়া আর হাসপাতাল ছিল না। সেখানে গিয়ে দেখি, সেখানকার ডাক্তার আগ্নীশ্বর। আগে আলাপ ছিল, খুব খাতির করে বসালে আমাদের নিজের কোয়ার্টাসে নিয়ে গিয়ে। বললে,

যদি আপত্তি না থাকে ডিনারের ব্যবস্থা করতে পারি। তখন রাত আটটা হবে। ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। বললাম, কর। কিন্তু আগে চল, যাদের ধরে এনেছি, তাদের একটা ব্যবস্থা করে ফেলা যাক। অগ্নীশ্বর যখন ওদের পরীক্ষা করছিল, তখনই সন্দেহ হল, ওদের মধ্যে একটা ছোকরা যেন ওর চেনা। ওর চোখমুখের ভাবভঙ্গী থেকে বুঝলুম সেটা। সে ছোকরার পেটের উপর দিয়ে একটা বুলেট চলে গিয়েছিল। অগ্নীশ্বর বললে, বোধহয় পেটে ঢুকেছে, পেট কাটতে হবে। আমাকে জিগ্যেস করলে, তুমি কি অপারেশন থিয়েটারে আমার সঙ্গে যাবে, না, ডিনার খাবে গিয়ে। আই টুক্ দি হিন্ট্। বললাম, অল রাইট, তুমি অপারেশন কর গিয়ে, আমরা ডিনার খেতে যাচ্ছি। ফিরে এসে দেখলাম, সে ছোকরা পালিয়েছে, অগ্নীশ্বর একটা মড়ার পেট কেটে ঢাকা দিয়ে রেখেছে। সম্ভবত কোনও আন্‌ক্লেম্‌ড্ বডি ছিল মর্গে। আমি বুঝতে পারলুম সবই, বাট্ আই ওভারলুক্‌ড্। আর জান? এই জন্যে তার উপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। হি ওয়াজ এ নাট্—”

আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা নিরাপদ মনে হইল না। দূরে কাপ্তেন সাহেবের গলার আওয়াজ শোনা গেল। তাড়াতাড়ি সেই দিকেই চলিয়া গেলাম।

পরদিন আবার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করিলাম। কথাপ্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম, লণ্ডনে তাঁহার এক আত্মীয় স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ট্রেনিং লইতেছেন। ইনি তাঁহারই বাসায় গিয়া উঠিবেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি করবেন? ফিরে আসবেন না নিশ্চয়। আপনার পাসপোর্ট আছে তো?”

“না। আমি সারেং সায়েবের দয়ায় লুকিয়ে জাহাজে ঢুকেছি। আমাকে নাবতে দেবে না, বোধহয়।”

ডাক্তারবাবু খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "আপনি কি নাবতে চান ?"

"চাই। কিন্তু কি করে সম্ভব হবে জানি না।"

"যে সারেং আপনাকে এনেছে, তিনিই কোন ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন হয়তো। বলেছেন তাঁকে কিছু ?"

"না, এখনও বলিনি।"

"বলে দেখুন। আমার কাছে কাল আসবেন একবার। আপনার ফোটো তুলে নেব একখানা।"

ভয় পাইয়া গেলাম।

"ফোটো ? কেন"

"এমনি নেব। আপনাকে ভালো লেগেছে আমার। একজন বি. এসসি পাশ ছেলে যে দরকার হলে চাকরের কাজও করতে পারে এটা—"

প্রশংসা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম—"অগ্নীশ্বর বাবুর লেখাটা কি আপনার পড়া হয়েছে ?"

"একটু বাকি আছে"

"পড়া হলে আমাকে দেবেন দয়া করে"

"দেব"

পরদিন আবার এক ফাঁকে তাহার কেবিনে গেলাম। তিনি অগ্নীশ্বরের লেখা খাতাটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "নিন্। পড়া হয়ে গেলে ফেরত দেবেন। হারায় না যেন"

"আমার ইচ্ছে আমি এটা টুকে নি। এতে আপনার আপত্তি নেই আশা করি।"

"টুকে নিতে পারেন, আপত্তি নেই, কিন্তু আগেই অত কষ্ট

করতে যাবেন কেন। পড়েই ফেলুন না আগে। ভালো লাগে টুকবেন।”

“আচ্ছা”

“আসুন, এবার আপনার একটা স্ন্যাপ তুলে নি। অদ্ভুত জিনিসের ফোটো সংগ্রহ করার বাতিক আছে আমার।”

“আমার মধ্যে কি এমন অদ্ভুত দেখলেন।”

“অদ্ভুত বই কি। বাঙালীর ছেলে হয়ে বি. এসসি. পাশ করে' আপনি এই চাকরি করছেন, এরকম আমি অন্তত দেখিনি।”

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, “আপনি হিন্দু হলে বোধহয় পারতেন না, মুসলমান বলেই পেরেছেন। হিন্দু বাঙালীর ছেলেরা বড় বিলাসী।”

“হিন্দু বাঙালী ছেলেদের সম্বন্ধে আপনার এ হীন ধারণা কেন?”

ক্যামেরাটা ঠিক করিতে করিতে তিনি হাসিয়া বলিলেন, “অভিজ্ঞতা থেকে এই ধারণা হয়েছে। হিন্দু বাঙালীর ছেলেরা পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেরানি হবার জন্যে আপিসের দরজায় মাথা কুটে বেড়াবে, রকে বসে আড্ডা মারবে, সিনেমায় ভীড় করবে, রাজনীতি নিয়ে হুজুক করবে, কিন্তু গতর খাটিয়ে পরিশ্রম করে' কিছু করবে না। ওদের স্বাধীন ব্যবসার দৌড় মণিহারী দোকান পর্যন্ত, সেখানে সকাল-সন্ধে একদল ছোঁড়া জুটিয়ে বেশ আড্ডা মারা যায়, ওদের স্বাধীন পেশার দৌড় বার-লাইব্রেরী পর্যন্ত, যেখানে পয়সা না থাক রাজা-উজির মারবার সুযোগ আছে, এম. এসসি. পাশ করেও উকিল হচ্ছে দলে দলে। আপনার মতো বেঠিক পথের পথিক হওয়া হিন্দু বাঙালীর ছেলের পক্ষে শক্ত। তাই আমার মনে হয়, বাংলা দেশে কার্নেগী, ফোর্ড যদি কোনও কালে জন্মায় তা জন্মাবে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে। ওরাই দুঃসাহসী, বেপরোয়া,

ওরাই মরীয়া হয়ে জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, ওদের মধ্যে আরব বেদুঈনদের রক্ত আছে। আপনাকে দেখে তাই খুব ভালো লাগলো—"

আমি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না। বলিয়া ফেলিলাম, "আমি মুসলমান নই, আমি হিন্দু বাঙালী।"

"বলেন কি, তাহলে মুসলমান বলে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন কেন ?"

"কারণ আছে"—

"কারণটা কি ?"

"আমার জীবন-মরণ সমস্যা এর সঙ্গে জড়িত। আপনি যদি প্রতিশ্রুতি দেন একথা গোপন রাখবেন, তাহলে সব খুলে বলতে আমার আপত্তি নেই। প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি রাখেন নি, এ রকম লোক অবশ্য আমি দেখেছি। আপনার প্রতিশ্রুতি পেলেও আমি হয়তো নির্ভয় হতে পারব না। কিন্তু আপনার মতো লোকের চক্ষে হিন্দু বাঙালীর ছেলে এতো হীন হয়ে আছে, এ আমি সহ্য করতে পারলাম না। তাই হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছি। যে হিন্দু-বাঙালীর ঘরে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘা যতীন, যতীন দাস, বিনয়, সুভাষ জন্মেছে, যাদের কীর্তি অমাবস্যার আকাশে অগণ্য নক্ষত্রের মতো ঝলমল করছে, তাদের আপনি ছোট বলবেন ? বাঙালীর ছেলে কুলি, রিক্সা-ওলা, মুটে-মজুর হতে পারছে না বলে আপনারা ক্ষুব্ধ হচ্ছেন, কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করছি, সোনা দিয়ে কখনও কোদাল হয় ? ভালো ইস্পাত দিয়েও কি হয় ? যারা আজ সারা ভারতে কুলি, রিক্সা-ওলা, মুটে-মজুর হয়ে রয়েছে, তারা কি শ্রমের মহিমা-মর্যাদায় মুগ্ধ হয়ে তা হয়েছে। তারা হয়েছে, তাদের অন্য কিছু হবার যোগ্যতা নেই বলে, তারা প্রচ্ছন্ন কার্নেগী বা ফোর্ড বলে নয়।

এটা সত্যি কথা, হিন্দু বাঙালীর ছেলেদের শারীরিক পরিশ্রমে রুচি নেই, তার কারণ তারা অন্য ধাতুতে গড়া। পেটের জন্যে তারা শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে পারে না। করতে উৎসাহ পায় না। কিন্তু আদর্শের জন্যে পারে। স্বদেশীর সময় ওই হিন্দু বাঙালীর ছেলেরাই জেলে যে শারীরিক নির্যাতন সহ্য করেছে তার তুলনা আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর নেই। তাদের জেলে নিয়ে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাতে হাতকড়া দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, উঠ-বোস্ করিয়েছে, দাঁড় করিয়ে পা দুটো টেনে যতদূর সম্ভব ফাঁক করা যায় তার চেয়েও বেশি করেছে, হাণ্টার মেরে ক্ষতবিক্ষত করেছে, ক্ষিধের সময় খেতে দেয় নি, তেষ্টার সময় জল দেয় নি, অসুখ হলে ওষুধ দেয় নি। গোঁফ ভুরু চুল টেনে টেনে উপড়ে ফেলেছে, তবু ওই হিন্দু-বাঙালীর ছেলেদের দমাতে পারে নি। শারীবিক কষ্টকে তুচ্ছ করেছিল তারা আদর্শের জন্যে। তারা আজ বাসন-মাজা চাকর, মুটে, রিক্সা-ওলা আর ফ্যাক্টারির কুলি হচ্ছে না বলে তাদের আপনি অবজ্ঞা করবেন? এ আমি সহ্য করব না—"

"বড্ড উত্তেজিত হয়েছেন। বসুন। দাঁড়ান, আমি কপাটটার খিল লাগিয়ে দি—"

সত্যিই আমি উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ডাক্তারবাবু কপাটটা ভালো করিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি যে হিন্দু-বাঙালীদের কথা বললেন, তাঁরা নমস্য সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরা তো নিঃশেষ হয়ে গেছেন। হিন্দু-বাঙালীর ঘরে ওরকম ছেলে আর আছে কি এখন?"

"নিশ্চয়ই আছে। বাঘের বংশে বাঘই জন্মায়। কিন্তু আপনারা ব্যাঘ্রবংশধরদের নতুন বুলির কারাগারে বন্দী করে, অনাহারে জরাজীর্ণ করে শেষে বলছেন, তোমরা লাঙল টানো,

ঘানি টানো, গাড়ি টানো। তা তারা পারবে কেন? তারা গরু হতে পারে নি বলে আপনারা তাদের গালাগালি দেবেন এ আমি সহ্য করতে পারব না। তবে এইখানেই একটা কথা স্পষ্ট করে দিতে চাই। হিন্দু-বাঙালীদের সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে বলেই তাদের কথা বললাম। এর থেকে এটা যেন মনে করবেন না যে, অহিন্দু বা অবাঙালীদের প্রতি আমার ঘৃণা আছে। তাঁদের কাছেও অনেক ঋণে ঋণী হয়ে আছি আমরা। সে ঋণ সারা জীবন অকুণ্ঠিত-কণ্ঠে স্বীকার করব। মুসলমান হাজি সাহেব, মুসলমান সারেং আমাকে যদি না সাহায্য করতেন, আমি কোথায় থাকতাম আজ। তাঁদের অনেকের কাছে এত ভালোবাসা পেয়েছি, যা নিজের লোকের কাছেও পাই নি। হিন্দু-বাঙালীর ছেলের এ-ও একটা বৈশিষ্ট্য, তারা সবাইকে আপন করে নিতে পারে—"

"বসুন, বসুন, ভালো করে বসুন। সব কথা শুনি আপনার। ভয় নেই, আমার কাছ থেকে কোনও কথা বেরুবে না।"

হাসিয়া বলিলাম, "ভয় আমার নেই। বেগতিক দেখি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব। সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়!"

তাঁহাকে আমার জীবন-কাহিনী শুনাইতে লাগিলাম।

কাহিনী শেষ হইলে উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পর ডাক্তারবাবু বলিলেন, "অদ্ভুত। আপনার কথাবার্তা শুনে প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু এতটা কল্পনা করতে পারি নি। কিন্তু একটা খটকা আমার এখনও আছে। বলব?"

"বলুন।"

"আপনি বলছেন, বাঙালী বিদ্রোহীর জাত। বিদ্রোহের আগুন জ্বালাবার সুযোগ পেলেই তার প্রতিভার মশাল দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত করে জ্বলতে থাকে। এ সুযোগ না থাকলে স্তিমিত হয়ে

পড়ে সে। কিন্তু এরকম অগ্নিকাণ্ড করে' করে' একটা জাত কতদিন বেঁচে থাকতে পারে ?"

"পারে বইকি। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেই তো একটা জাত বেঁচে রয়েছে, যারা চির-বিদ্রোহী। এরা বৈদিক সভ্যতা, বুদ্ধ সংস্কৃতি, গ্রীক আক্রমণ, মুসলমান আক্রমণ, তৈমুর, নাদিরশাহ সব হজম করে বসে আছে। ইংরেজের কাছেও মাথা নোয়ায় নি। আমান-উল্লা এদের আত্মার আধুনিক নমুনা। এখনও তারা অপমানের জবাব দেয় রাইফেলের গুলি চালিয়ে, আবেদন-নিবেদন করে' নয়। ওরা মুসলমান, কিন্তু ওরা বাঙালীর স্বগোত্র, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ওদের কাছেই গিয়েছিলেন সেইজন্য—"

"কিন্তু এরকম করে' কি একটা জাত বাঁচবে ?"

"হয়তো বাঁচবে না। রানা প্রতাপ সিং বাঁচে নি, শিবাজী বাঁচে নি, লক্ষ্মীবাঈ বাঁচে নি, আমি যে সব বাঙালীকে বাঙালী জাতির গৌরব বলে মনে করি, তারাও বাঁচবে না। কিন্তু কালের কষ্টিপাথরে যে দাগটা তারা রেখে যাবে, সেটা সোনার দাগ।"

"কিন্তু কেউ যদি না বাঁচে, তাহলে শুধু সোনার দাগ নিয়ে কি হবে—"

"আপনার ভয় নেই, ওই বাঙালীরই মধ্যে এমন একদল লোক আছে, যারা চাকরি করে', সেলাম করে', খোশামোদ করে', অপরের মন জুগিয়ে ঠিক বেঁচে থাকবে আর শুয়োরের পালের মতো বংশ-বৃদ্ধি করে যাবে। এদের কথাই কবিগুরু একটা কবিতাতে বলে গেছেন, "ভদ্র মোরা শান্ত বড় পোষমানা এ প্রাণ, বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান। দেখা হলেই মিষ্ট অতি, মুখের ভাব শিষ্ট অতি, অলস দেহ ক্লিষ্টগতি, গৃহের প্রতি টান।" এদের কেউ মারতে পারবে না। এরা পোকামাকড়ের মতো অমর। এদের মারবার মতো ডি. ডি. টি. বেরোয় নি এখনও।"

"কিন্তু এদের নিয়েই তো জাত। এদের কথা ভাবতে হবে বই কি।"

"এরা জৈবিক নিয়মে চলে। প্রকৃতিই এদের জন্যে ভাবছেন। আমাদের ভাবনা প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তানদের জন্যে, যারা প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলে না।"

ডাক্তারবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তাই আপনার অগ্নীশ্বর মুকুজ্যের উপর এত ভক্তি। এ লেখাটা পড়ে সুখ পাবেন। এটা আপনার যদি খুব ভালো লাগে, আপনার কাছে রেখে দিতেও পারেন। আমি হয়তো কোথাও হারিয়ে ফেলব।"

"উনি কোথায় আছেন এখন---"

"কোথাও সিভিল সার্জন হয়ে আছেন। কিছুদিন আগে চব্বিশ পরগণায় ছিলেন, এখন কোথায় আছেন, ঠিক জানি না।"

"আমি এবার উঠি তাহলে আজ।"

"আচ্ছা, আপনি বিলেতে গিয়ে যদি পৌঁছতে পারেন, কি করবেন তা কি ঠিক করেছেন কিছু?"

"কিছু ঠিক করি নি। কিন্তু কাল রাত্রে একটা কথা মনে হচ্ছিল। যদি ওখানে সুযোগ পাই, পুলিশের লাইনে ট্রেনিং নেব।"

"পুলিশের লাইনে?"

"হ্যাঁ। পুলিশ হয়ে এদেশেই ফিরে এসে পুলিশের চাকরি করব। যে পুলিশ আমাদের এত লাঞ্ছনা করেছে, তাদেরই এক জন হব।"

"উদ্দেশ্য কি?"

"বিপ্লবী এদেশে চিরকালই থাকবে। যতটা পারি তাদের বাঁচাব। এই আশা। অবশ্য দুরাশাই এটা।"

"আমার এক দূর সম্পর্কের দাদা ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের সুপারিশে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ট্রেনিং নিচ্ছেন। তিনি ভারতবর্ষে পুলিশেরই

চাকরি করেন, বড় অফিসার, উপরওলার নেক-নজরে প'ড়ে' বিলেতে যেতে পেরেছেন। আমি তো তাঁর বাসাতেই উঠব। আপনার কথাটা মনে রাখব। যদি অবশ্য বিলেতে নেবে আপনার নাগাল পাই।"

"নাগাল নিশ্চয়ই পাবেন। আমার নিজের গরজেই আমি আপনার পিছু নেব। কিন্তু আপনার যে দাদা ভারতবর্ষে পুলিশের চাকরি করে' গভর্নমেণ্টের পেয়ারের লোক হয়েছেন, তিনি তো আমাকে হাতে পেলে সন্দেশের মতো মুখে ফেলে দেবেন টপ্ করে'। হয়তো আমার ফোটো তাঁর অ্যালবামে আছে।"

"যদি থাকেও, কিছু এসে যাবে না। আপনার চেহারা তখন অন্যরকম ছিল নিশ্চয়। অতি বিচক্ষণ ডিটেকটিভও এখন আপনাকে দেখে হিন্দুর ছেলে বলে সন্দেহ করবে না।"

আমি উঠিতেছিলাম, এমন সময় ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি চাকর-বাবুর্চির কাজ করেছেন। রান্নাবান্না কিছু শিখেছেন কি ?"

"খুব। হিন্দুদের শুক্তো, চচ্চড়ি, ডালনা এসব তো জানাই ছিল, হাজী সাহেবের বাড়িতে মুসলমানী রান্নাও শিখেছি কিছু কিছু। শিককাবাব, সামিকাবাব, মুর্গ মুসল্লম, বিরিয়ানি—"

"তাহলে একটা রাস্তা পাওয়া গেলেও যেতে পারে।"

"কি রকম ?"

"পরে বলব।"

৫

ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের 'আধুনিক পঞ্চকন্যা' সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি।

কল্যাণবরেষু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। উত্তর দিতে দেরী হল। কারণ তোমার অজ্ঞতার পাহাড় ওড়াতে হলে যে ডিনামাইটের দরকার তা হাতের কাছে ছিল না। জোগাড় করতে দেরি হয়ে গেল। তুমি পঞ্চকন্যার মহিমা বুঝতে পার নি, তার কারণ যদিও তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, এম-বি পাশ করেছ, সাহেবী পোশাক পরে বেড়াও, হয়তো লুকিয়ে অখাদ্য কুখাদ্য খাও, পরের পয়সায় পেলে ভালো মদেও অরুচি নেই, কিন্তু আসলে তুমি একটি পদিপিসি। ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসে এই পদিপিসিরা যে কাণ্ড করেছে তার একমাত্র তুলনা মেলে বোধহয় বর্বরসমাজের ডাইনী আর উইচ্ ডক্টরদের কার্যকলাপে। সভ্যসমাজ এদের পুড়িয়ে মেরেছে, সেই খাণ্ডব-দাহনে জোয়ান অব আর্কের মতো দু-চারটে ভালো লোক পুড়ে মরেছে হয়তো, কিন্তু এতে ওদের সমাজ থেকে বন্য বর্বর আগাছাগুলো দূর হয়েছে। ওদের বাড়ির উঠোন এখন তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে, ওদের সবুজ লন আর ফুলের বাগান দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু আমাদের দেশে ওই পদিপিসির দল এখনও সশরীরে প্রবল প্রতাপে বর্তমান। এই পদিপিসিরা অসামান্য লোক, অসামান্য তাদের শক্তি। এর প্রমাণ আর্যসংস্কৃতির বিরাট মহা-মাতঙ্গকে এরা হিন্দুধর্মের ঘোরো শূয়োরে পরিণত করেছে। আর্যসভ্যতার আকাশচুম্বী হর্ম্যের গা বেয়ে উঠেছে উইয়ের মতো। ধসিয়ে দিয়েছে সে হর্ম্যকে। সেই ধ্বংস-স্তূপের উপর গজিয়েছে

ঘেঁটু, ফণীমনসা, বুনো ওল আর কুটকুটে কচুর বন। আর সেই বনের আড়ালে বাস করছে যেসব শামুক-ব্যাং, টিকটিকি-গিরগিটি, ইদুর-ছুঁচো, সাপ-তক্ষকের দল তারাই টিকি-তিলক গেরুয়া-গুরুর ভড়ং করে আলো করছে তোমাদের রক্ষণশীল সনাতন হিন্দুধর্মের চণ্ডীমণ্ডপগুলো। আগে এই চণ্ডীমণ্ডপগুলো গ্রামে গ্রামে থাকত। এখন তারা শহরেও এসেছে। ইউনিভার্সিটিতে, সাহিত্য-সভায়, রাজনীতির আসরে, খবরের কাগজের পাতায় পাতায় এদের খুব দবদবা আজকাল। তোমরা এদের বক্তৃতা শুনে গদগদ। উচ্ছ্বাসের আবেগে এবং তর্ক করবার মুখে তোমরা মাঝে মাঝে নিজেদের আর্যবংশধর বলে জাহির কর, কিন্তু আর্যরা, মানে বৈদিক যুগের আর্যরা, কি ছিল আর তোমরা কি হয়েছ, তা তুলনা করে' দেখেছ কখনও? তারা গরু, শুয়োর, কচ্ছপ কিছু বাদ দিত না। তোমরা লাউ খাবে তা-ও পাঁজি দেখে, অলাবু ভক্ষণ নিষেধ আছে কিনা বিচার করে'। তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল শত শরৎ বাঁচব, বীরের মতো বাঁচব, বেগবতী প্রস্তরাকীর্ণ নদী সামনে পড়লে সাঁতরে পার হব, পৃথিবীকে ভোগ করব, মৃত্যু এলে তাকে বীরের মতো বরণ করব। কিন্তু তোমরা দিন-রাত কাঁদুনি গাইছ 'লোহারি বাঁধনে বেঁধেছে সংসার, দাসখৎ লিখে নিয়েছে হায়,' তোমরা গাইছ—'এ সংসার-কারাগারে আর কতদিন আমারে এমন করে বেঁধে রাখবি মা তারা,' কিন্তু মা-তারা যেই সদয় হয়ে মুক্তির ব্যবস্থা করলেন অমনি বাবারে মারে বলে মুক্তকচ্ছ হয়ে দে দৌড়। সিন্নি মেনে, মাদুলি বেঁধে, ঠাকুরের দোর ধরে, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়ে বাঁচবার জন্যে হাস্যকর সে কী করুণ প্রয়াস। তোমরা ভালো করে বাঁচতেও জান না, মরতেও জান না। তোমরা পেট ভরে খেয়েছ কখনও? প্রাণভরে কোনও মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছ? প্রাণভরে ভালোবাসতে পেরেছ কাউকে? প্রাণভরে ঘৃণা করতে পেরেছ? কিছুই পারনি। অপরে যখন

ভোগ করে তখন তোমরা আড়নয়নে চেয়ে দেখ আর আড়ালে মুখ চোকাও। আর মুখে বল, 'হরি হে সবই মায়া'! নারী তো তোমাদের কাছে নরকের দ্বার। অনেক কষ্টে, অনেক খতিয়ে, অনেক অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে, সপ্তমে বা অষ্টমে মঙ্গল বা শনি আছে কিনা দেখে, পণ নিয়ে মেয়ের বাবাকে সর্বস্বান্ত করে, তোমরা হাড় ডিগ্‌ডিগে একটি বালিকার পাণি-পীড়ন কর আর সেই নরকের দ্বারটির চৌকাটে বসে' সারা জীবন হন্যে হ্যাংলার মতো বংশবৃদ্ধি করে যাও, আর ক্রমাগত খবরদারি করতে থাক ওই নরকের দ্বারে এসে আর কেউ উঁকি দিচ্ছে না তো। উঁকি দিলেই সর্বনাশ; তাকে ঝেঁটিয়ে বাড়ি থেকে যতক্ষণ না বিদায় করতে পাচ্ছ ততক্ষণ তোমাদের শান্তি নেই। তোমাদের সমাজের গোলক চাটুজ্যেরা তা না হলে তোমাদের একঘরে করবে, তোমাদের ঊর্ধ্বতন অধস্তন চোদ্দ পুরুষরা স্বর্গের পথে যেতে যেতে হঠাৎ হোঁচট খাবে। তোমরা কি বলে' নিজেদের আর্যবংশধর বল তা তো বুঝি না, তাদের সঙ্গে কোনখানটায় মিল তোমাদের? স্ত্রী দ্বিচারিণী হলে তাদের ব্যবস্থা ছিল—তাকে উপদেশ দিও, বোঝাবার চেষ্টা কোরো, তিরস্কার কোরো, দরকার হলে প্রহারও কোরো। তাতেও যদি কোন ফল না হয় তাহলে তাকে বর্জন কোরো, কিন্তু অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করতে ভুলো না। তাকে গলাধাক্কা দিয়ে একেবারে বেশ্যা-পল্লীতে পাঠিয়ে দেবার নিয়ম তাঁদের সমাজে ছিল না। সতীত্ব জিনিসটা তাঁরা যে অপছন্দ করতেন তা নয়, কিন্তু ও নিয়ে তোমাদের মতো ছুঁই-ছুঁই গেল-গেল ভাব ছিল না। এ বিষয়ে অত্যন্ত র‍্যাশনাল ছিলেন তাঁরা। ক্ষেত্রজ পুত্রে আপত্তি ছিল না তাঁদের। এমন কি দরকার হলে বিধবার গর্ভেও তাঁরা পরপুরুষকে দিয়ে পুত্র উৎপাদন করিয়ে নিতেন, তাতে যে বিধবার ব্রহ্মচর্য নষ্ট হতে পারে একথা তাঁরা মানতেন না। তোমরা এঁটো পাতে বসে

মাছি তাড়িয়ে তাড়িয়ে ভাত খাও, অপরের ব্যবহার-করা পায়খানা বা গামছা-তোয়ালে ব্যবহার করতে তোমাদের আপত্তি নেই, সিফিলিস-গণোরিয়া-গ্রস্ত বেশ্যাদের সহবাসেও তোমরা আনন্দ পাও, কিন্তু স্ত্রীর যদি একবার পা ফস্‌কেছে অমনি সর্বনাশ। অমনি তোমাদের চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যায়, কুলে কালী পড়ে, পূর্ব-পুরুষরা নরকস্থ হন।

তোমাদের আর্যত্ব কোথায়? তাদের নকলে তোমাদের বিয়ে-পৈতেটা হয় বলছ? কিন্তু কী হাস্যকর কাণ্ডটা হয় তা ভেবে দেখেছ কখনও। আর্যদের ব্রহ্মচর্যাশ্রম জীবনের প্রথম আশ্রম, যে সময়ে ছাত্ররা গুরুগৃহে বাস করে' নিজেদের চরিত্র গঠন করত। তোমরা সেটা সেরে দাও ন্যাড়ামাথা ছেলেটাকে একটা গুদোম ঘরে তিনদিন বন্ধ করে' রেখে। তিনদিন সে শূদ্রের মুখ দেখবে না। তারপর বছর খানেক খেতে বসে' বোবার অভিনয় করবে। গায়ত্রীর মানে সে বুঝবে না, কেবল আউড়ে যাবে। এই হল তোমাদের উপনয়ন। পৈতেতে পরে চাবি বাঁধা থাকবে। আর বিয়ের সময় তোমাদের স্ত্রী-আচারটা বড়, না বরযাত্রী-কন্যাযাত্রীর ভোজটা বড়, না একটা মূর্খ পুরুতের সামনে বসে নামতা-ঘোষার মতো কতকগুলো অশুদ্ধ উচ্চারণের মন্ত্র আওড়ানোটা বড় তা আজও বুঝিনি। দিনের বেলা কতকগুলো ভিজে-কাঠ জ্বেলে চতুর্দিকে একটা ধূম্রলোক সৃষ্টি করে তোমাদের কুশণ্ডিকা হয়। পুরোহিত যখন বলেন, ওই দেখ সপ্তর্ষি উঠেছে, ওই দেখ বশিষ্ঠের পাশে অরুন্ধতী, তখন তোমরা দেখ রঙীন কাপড়-পরা কতকগুলো মেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে কিম্বা যদি ঘাড় তুলে আকাশের দিকে চাইতে যাও, দেখতে পাও ঘরের কোণে অরুন্ধতী নয়, একটি মাক'শা জাল পেতে বসে আছে। তোমরা বিয়ের সময় শুধু যে পণ নাও তা নয়, প্রজাপতি আর ব্রহ্মার ছাপ-দেওয়া কতকগুলো

নিমন্ত্রণপত্রও ছাপ আর চেনা অল্পচেনা অচেনা সবার নামে সেগুলো পাঠাও বুকপোষ্ট করে'—উদ্দেশ্য যদি কিছু লৌকিকতা পাওয়া যায়। অনেকে যদিও নীচে ছেপে দেন, 'লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়', কিন্তু সত্যি সত্যি কেউ যদি সে প্রার্থনার মর্যাদা রেখে লৌকিকতা না পাঠিয়ে আশীর্বাদ জানায়, তাহলেই মনোমালিন্য হয়ে যায় তার সঙ্গে। এই তোমাদের বিয়ে। এর সঙ্গে আর্য-বিবাহের কোন মিল নেই।

আর্যদের সঙ্গে কোনওখানটায় তোমাদের মিল নেই। হয়তো আর্য-সভ্যতা একদিন বাংলাদেশের আদিবাসী পক্ষীজাতি বা বগধজাতিকে জয় করে' তাদের আর্যত্বের ছাঁচে ঢালবার চেষ্টা করেছিল, কিছুলোক হয়তো আর্য-ধর্ম আর্য-সভ্যতা বরণও করেছিল। এটাও একটা লক্ষ্য করবার মতো জিনিস, বাইরে থেকে নতুন কিছু একটা এলেই তাকে বরণ করে' নেবার জন্যে একদল লোক বাংলাদেশে সর্বদা উদ্বাহু হয়ে থাকে। ওরা আর্য হয়েছে, বৌদ্ধ হয়েছে, মুসলমান হয়েছে, বৈষ্ণব হয়েছে, ক্রিশ্চান হয়েছে, ব্রাহ্ম হয়েছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে বাঙালী সেই বাঙালীই থেকে গেছে। ওদের মধ্যে আত্মিকেলে সেই পদিপিসি আছে যে! সে তার জারক রসে সব্বাইকে মোরব্বা বানিয়ে ফেলেছে। ওই পদিপিসির সাংঘাতিক শক্তি। শঙ্করাচার্যের মতো বৈদান্তিকও ওর পাল্লায় পড়ে "প্রভুমীশ মনীষ" আউড়েছে, ছন্দের জল-তরঙ্গ বাজিয়ে গঙ্গার মহিমা-কীর্তন করেছে। ক্রিশ্চান অ্যানটনি কবিওলা হয়েছে, মুসলমান রাধাকৃষ্ণের গান গেয়েছে, বৈষ্ণবের ধর্ম নেড়া-নেড়ীর ধর্ম হয়েছে, নিরাকারবাদী ব্রাহ্মদের বাড়ির অনেক মেয়েরা দুর্গাপূজার মণ্ডপে ভীড় করেছে শাড়ি-গয়না-খোঁপার বাহার দেখিয়ে, ঠাকুরকে প্রণাম করেছে, মানত করেছে, সিন্নি মেনেছে।

তবে এইখানেই তোমার একটা ভুল ভেঙে দেওয়া উচিত। আমার এই লম্বা বক্তৃতা শুনে তুমি যেন ভেব না যে, আমি খুব একটা আর্য-ভক্ত। মোটেই তা নয়, আমি বাঙালী and I am proud of it. তোমার চিঠিতে 'আর্য' শব্দটা অনেকবার ছিল বলে এই বক্তৃতাটা দিলুম। আর্যদের চেয়ে আমাদের নিকটতর সম্পর্ক নিগ্রেট, অস্ট্রীক, আর দ্রবিড়দের সঙ্গে। আমি আর্যদের মহিমা প্রত্যক্ষ করেছি বই পড়ে, মুগ্ধ হয়েছি তাদের বলিষ্ঠ চরিত্রে, তাদের মানবতার প্রবল প্রকাশে। তারা দেবতা নয়, তারা ভোগী বীর। তারা তাদের দেবতাদেরও নিজেদের ছাঁচে ফেলে তৈরি করেছিল। তাদের দেবতা 'অব্রণং অস্নাবিরং' ব্রহ্ম নয়, তাদের দেবতা তাদেরই মতো শক্তিমান, তাদেরই মতো খোশামোদে তুষ্ট, অপমানে রুষ্ট, তাদেরই মতো কামুক এবং ভোগী। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, সোম এদেব কাহিনী কেচ্ছার মতো মনে হয় ভদ্রসমাজে। কিন্তু এদের বলিষ্ঠতায় আমি মুগ্ধ। গ্রীকদের সঙ্গে অনেক মিল আছে এদের। গ্রীক সভ্যতাও মুগ্ধ করেছে আমাকে। ইজিপ্টের অনেক জিনিসও খুব ভালো লেগেছে। চীনেদেরও। কিন্তু আমার যা ভালো লাগে তা আমি হতে পারি না, অনেক সময় হতে চাই-ও না। যুগপৎ আর্য, গ্রীক, মিশরী এবং চীনে হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোনান ডয়েলের শার্লক হোম্‌সকেও খুব ভালো লেগেছে বলে কি শার্লক হোম্‌স হতে পারি? পারি না, হতে চাই-ও না। আমি অতি-বিশুদ্ধ জিনিস খুব পছন্দ করি না। তোমাদের মরাল কোডের অতি-বিশুদ্ধতা থেকে শত-হস্ত দূরে থাকতে চাই। একটা গল্প মনে পড়ল।

বিহারে যখন ছিলুম তখন এক ভোজপুরী ভদ্রলোকের ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলুম। জমিদার লোক তিনি। অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে করজোড়ে প্রত্যুদ্‌গমন করে আমাকে এনে

বসালেন। ভদ্রলোকের শুধু গা, গলায় হলদে রঙের পৈতে, পায়ে খড়ম, কপালের মাঝখানে, দুই বাহুর উপর, চন্দনের ডোরা-কাটা। আমি যতক্ষণ না বসলুম ততক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। এরকম নির্ভেজাল ভদ্রতা ভালো লাগা উচিত, কিন্তু আমার কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল। এর চেয়ে আমাদের বাঙালী ভদ্রতা অনেক নীচু স্তরের। বাড়ির মালিক হয়তো মুচকি হেসে বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন, বড়জোর বললেন 'আসুন'। কিম্বা কেউ যদি উচ্ছ্বসিত হন, বলবেন—'আরে আরে আসুন। আজকের কাগজটা দেখেছেন। চা বাগানে কি কাণ্ড!' এই ভালো লাগে কিন্তু। তারপর তাঁরা যখন খেতে দিলেন আমাকে, তখন তো আমার চক্ষুস্থির। ব্রাউন রঙের মোটা মোটা লুচি, তার সঙ্গে দাগড়া-দাগড়া করে কাটা কুমড়োর তরকারি, কাঁচকলার তরকারি, উচ্ছের তরকারি। প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা, এক তরকারির সঙ্গে আর এক তরকারি মেশায় না ওরা। তারপর দু'তিন রকমের আচার। তারপর ছালি-সমেত ধোঁয়াগন্ধ একনাদা দই, তার উপর লালচে রঙের দেশী চিনি। একটু পরে টেনিস বলের সাইজের হলদে রঙের লাড্ডুও এল আধ ডজন। এরা যেন আমার দিকে চেয়ে নীরবে চ্যালেঞ্জ করতে লাগল—চলে আয়, দেখি তোর মুরদ। খাওয়া ব্যাপারে আমার মুরদ চিরকালই কম। আমি টুকিটাকি খেয়ে থাকতেই ভালোবাসি। নিমন্ত্রণ বাড়িতে প্রায় বাঁ দিকটা খাই না, ডানদিকের তরকারিগুলো খাই। ভোজপুরী ভদ্রলোকের ভয়ানক আয়োজন দেখে 'থ' হয়ে বসে রইলুম। ভদ্রলোকের ভাইপো কলকাতার কলেজে পড়েন, বাংলাও বলেন। তিনি আমাকে বললেন, "আপনি খাচ্ছেন না কেন ডাক্তারবাবু। সবই ঘরের জিনিস, একেবারে বিশুদ্ধ। আমাদের জমিতে যে গম হয় তাই ঘরে জাঁতায় পিষিয়ে আমরা আটা করি, তরিতরকারি

সবজি সব আমাদের বাগানের, ঘি দুধ দই সব ঘরের, পঁচিশটি মোষ আছে আমাদের, লাড্ডুও ঘরে বানিয়েছি আমরা। খেয়ে দেখুন।"

করুণকণ্ঠে বললুম, "আমি পারব না।"

"পারবেন না! কেন?"—সত্যি সত্যি অবাক হয়ে গেল ছোকরা। তখন তাকে খুলে বলতে হল। বললাম, "আমি যে বাঙালী। বিশুদ্ধ জিনিস বরদাস্ত করতে পারি না। ভেজাল-ঘিয়ে-ভাজা ভেজাল কলের ময়দার ধবধবে শাদা ফুরফুরে লুচি আমাদের পছন্দ, কলকাতার দোকানে দোকানে মাটির ভাঁড়ে করে যে দই বিক্রী হয় তাতে আসল মাল কিছু নেই, কিন্তু তাই খেয়েই আমরা মুগ্ধ। খাঁটি জিনিস আমাদের ধাতে সয় না, পেটেও সয় না।"

আর্য-সভ্যতার বিশুদ্ধ বলিষ্ঠতাও আমার সহ্য হয় না, বই পড়ে নকল আর্য হবার বাসনা আমার নেই। ভীম-ভীষ্মকে বাহবা দিতে পারি, কিন্তু আমি একটা ভীম হয়ে দুঃশাসনের রক্তপান করছি বা ভীষ্ম হয়ে অম্বা-অম্বালিকা হরণ করছি একথা কল্পনা করলেও গায়ে জ্বর আসে। না, আমি খাঁটি বাঙালী, খাঁটি বাঙালীই থাকতে চাই। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, পরনে শান্তিপুরের ধুতি, পায়ে পাম্‌সু এর চেয়ে বেশি জবড়জং পোশাক পছন্দ করি না। কোন শিরস্ত্রাণও নয়, তা সে গান্ধি-ক্যাপই হোক, বা মাড়োয়ারি গোল টুপিই হোক। শিরোভূষণ নিয়ে বাঙালীরা অনেক experiment করেছে, রামমোহন বঙ্কিমের ছবিতেও টুপি দেখিতে পাই, কিন্তু বাংলাদেশের সেরা মানুষ বিদ্যাসাগরের মাথায় টুপি নেই। শুনেছি অমৃতলাল বসু নাকি বলেছিলেন—"We do not want to load our head with anything but intelligence." কথাটা শুনতে ভালো। কিন্তু আমি বলি, আমরা আমাদের মাথা আর আকাশের মাঝখানে কোন পার্টিশন দিতে রাজি নই। খোলা হাওয়ায় আমাদের মাথা, আমাদের প্রতিভা, আমাদের মনের

সবুজ শোভা সুস্থ থাকে। বদ্ধ হাওয়ায় মারা যাই আমরা। কোন রকম 'ইজ্‌মে'র খোঁয়াড়ে ঢুকলেই আমাদের মৃত্যু, তা সে ধর্মের 'ইজ্‌ম্'ই হোক বা রাজনীতির 'ইজ্‌ম্'ই হোক। অনেকবার এরকম মরেছি আমরা, আবার কি মন্ত্রবলে জানি না, বেঁচেও উঠেছি অনেকবার। সে মন্ত্রটা কি জানো? বিদ্রোহের মন্ত্র। কারও ভাঁওতায় পড়ে কিছুক্ষণ একটা আড়গড়ায় ঢুকে যখন আমরা হাঁপিয়ে উঠি, তখন আর দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না, সেখানে থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চাই মরীয়া হয়ে, ফ্রাইং প্যান থেকে লাফিয়ে হয়তো 'ফায়ারে' পড়ে' ভস্মীভূত হয়ে যাই অনেকে, তবু লাফাতে ছাড়ি না। ওরই মধ্যে দু'চারজন বেঁচেও যায় আর তারাই শেষে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয় সেই অচলায়তনকে। এইরকম করেই আমরা যুগে যুগে বেঁচেছি এবং বাঁচবও। আর এই মন্ত্রের সাধক বলেই আমি বাঙালী, এই অগ্নিকে সযত্নে লালন করি বলেই আমি সাগ্নিক। মাতৃজঠরে এই আগুন আমার মনে আমার অজ্ঞাতসারে জ্বালিয়ে দিয়েছেন জানি না আমার কোন পূর্বপুরুষ, কিন্তু এটা জানি—চিতার অগ্নিশিখার সঙ্গে মিলে যাবার পূর্বে এর শিখা নিভবে না, নিভতে দেব না।

কিন্তু দেখ, কি কাণ্ড করছি। পঞ্চকন্যা নিয়ে আলোচনা করব বলে কলম ধরেছিলুম, কিন্তু নিজের কথাই সাতকাহন করে' বলে' যাচ্ছি। এটাও বাঙালীর একটা বৈশিষ্ট্য।

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরীস্তথা
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যম্ মহাপাতকনাশনম্॥

এই হচ্ছে শ্লোক। এর একটা অর্থ এ-ও হতে পারে যে, মহাপাতক থেকে যদি বাঁচতে চাও, তাহলে এই পাঁচটি পাজি মেয়ের কথা মনে রেখ। এরা দাগী। এটাকে ব্যাজস্তুতি মনে করলেই বা ক্ষতি কি?

কিন্তু আরও কয়েকটা ব্যাখ্যা আমি দিতে পারি। একাধিক পুরুষের সঙ্গে কোনও স্ত্রীলোকের সংস্রব থাকলে সেকালের আর্যরা তেমন কিছু মনে করতেন না। তাঁরা পাপ-পুণ্যের বিচাব করতেন তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য থেকে। হত্যা করা মহাপাপ, কিন্তু মাংসলোলুপ অতিথির সেবার জন্যে কর্ণ যখন তাঁর ছেলেকে হত্যা করলেন, অমনি বাহবা বাহবা পড়ে গেল। মাংসলোলুপ অতিথি ভগবানে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন, বর দিলেন কর্ণকে। "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"—এটা আর্যদেরই উক্তি, আবার দেখছি, আর্যদের মহাকাব্য রামায়ণে সূর্যবংশের উজ্জ্বলতম রত্ন, নর-রূপী নারায়ণ শ্রীরামচন্দ্র তাঁর সতী স্ত্রীকে নিরপরাধিনী জেনেও বনবাসে পাঠাচ্ছেন আর সেজন্য সবাই তাঁকে ধন্য ধন্য করছে। এর কারণ, দেশের যে আইন তখন প্রচলিত ছিল সেই আইন অনুসারে তিনি নিজেও চলেছিলেন, নিজের বেলায় আইনের অপলাপ করেন নি, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, তাই সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন বলেই তাঁর কদর আরও বেড়ে গেল। মাতৃহত্যা মহাপাপ। কিন্তু আর্য-সভ্যতায় মাতার চেয়ে পিতার স্থান বেশি উঁচুতে। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমন্তপ। সেই পিতার আদেশে পরশুরাম মাতৃহত্যা করেছিলেন। বংশরক্ষা করা আর্যদের একটা অবশ্য কর্তব্য পুণ্যকর্ম, কিন্তু পিতার সুখের জন্যে ভীষ্মের মত অত বড় একটা তাগড়া পুরুষ চিরকুমার রয়ে গেল, এজন্য তার নিন্দা করে নি কেউ, সাধুবাদই করেছিল। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ খুঁজলে এরকম অনেক উদাহরণ মিলবে। আর্যরা পাপ-পুণ্যের বিচার করতেন শুধু ঘটনাটি দেখে নয়, ঘটনার পিছনের প্রেরণা দেখে। শুধু আর্যরা কেন, সব সভ্যদেশেই বোধহয় এই আইনে পাপ-পুণ্যের বিচার হয়, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল তাই আমাদের চোখে খুনী নয়, শহীদ। এখন এই পটভূমিকায় ওই

পঞ্চকন্যার বিচার করা যায়। এ সম্বন্ধে আর একটা কথাও মনে রাখা উচিত—বৈদিক আর্যদের কাছে দেবতা এবং রূপবতী নারীর সাতখুন মাফ ছিল। অহল্যা ছিলেন পরম রূপবতী এবং অহল্যাকে নষ্ট করেছিলেন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। আজকাল যেমন ভোটের জোরে কেষ্ট-বিষ্টু হওয়া যায়, তখন তেমনি তপোবলে ইন্দ্রত্ব লাভ করা যেতো। তাই কোন মানুষ তপোবলে বলীয়ান হয়ে উঠেছে এ খবর পেলে, দেবকুল, বিশেষ করে ইন্দ্র, একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন। ক্রমাগত চেষ্টা করতেন, কিসে লোকটার তপোবল কমিয়ে দেওয়া যায়। সাধারণত স্বর্গের অপ্সরাদের তাঁরা কাজে লাগাতেন। অপ্সরা দেখলেই বেসামাল হয়ে পড়তেন তপস্বীরা, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের তপোবল কমে যেত, ইন্দ্র নিশ্চিন্ত হতেন। অহল্যার স্বামী মহর্ষি গৌতমকে কিন্তু অপ্সরা পাঠিয়ে কাবু করা সম্ভব ছিল না, কারণ তাঁর স্ত্রী অহল্যা ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। অহল্যাকে দেখে ইন্দ্র নিজেই কামার্ত হয়ে পড়লেন। অবশেষে একদিন গৌতমের ছদ্মবেশে গেলেন তিনি অহল্যার কাছে গৌতমের অনুপস্থিতিতে। তিনি যে আসল গৌতম নন তা অহল্যা বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু তবু প্রত্যাখ্যান করে নি। এইখানেই তার পাপ। কাজ সেরে নকল গৌতম যখন ফিরে যাচ্ছেন, তখন আসল গৌতমের সঙ্গে তার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল তপোবনের প্রান্তে। আসল গৌতম তপোবলে নিমেষে বুঝতে পারলেন কি ঘটেছে। তৎক্ষণাৎ রেগে অভিশাপ দিয়ে তিনি ইন্দ্রকে করে দিলেন নপুংসক আর অহল্যাকে করে দিলেন ভস্মীভূত. কোনও কোনও পুরাণে আছে পাষাণ। ইন্দ্র একটু বেকায়দায় পড়লেন বটে, কিন্তু তির্যকভাবে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়ে গেল। রাগলে তপোবল কমে যায়। গৌতম রেগেছিলেন, তাঁর তপোবল কমে গেল। ইন্দ্র ফিরে গিয়ে অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদের বললেন, আমি

মহর্ষি গৌতমের ক্রোধ সমুৎপাদন করে' তাঁর তপস্যার বিঘ্ন সৃষ্টি করেছি। এতে দেবকার্য সাধিত হয়েছে। রেগে অভিশাপ দেওয়াতে মহর্ষির দীর্ঘকালীন তপোবল অপহৃত হয়েছে। কিন্তু এজন্য আমার ও অহল্যার যে দুর্গতি হলো তার ব্যবস্থা করুন আপনারা। দেবকার্য যখন সাধিত হয়েছে তখন আর কথা কি। ইন্দ্রের নপুংসকত্ব মোচনের ব্যবস্থাও তাঁরা করলেন, আর রামচন্দ্রকে নিয়ে গিয়ে অহল্যাকেও পরে উদ্ধার করলেন। যে নারী দেবকার্য সাধনের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করেছে, তাকে কি তাঁরা উপেক্ষা করতে পারেন? সুতরাং সে যে প্রাতঃস্মরণীয়দের পুরোভাগে স্থান পাবে এতে আশ্চর্য হবার কি আছে। এ যুগেও তো এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটছে। আজকাল দেবতাদের আমরা বরখাস্ত করেছি। তার জায়গায় বসিয়েছি দেশকে, রাজনীতিকে, সাহিত্যকে, আর্টকে, বিজ্ঞানকে। এইসব দেবকার্য সাধনের জন্যে যেসব নারীরা কৃচ্ছ্র-সাধন করেছেন, তাঁদের কি তোমরা সম্মানের আসনে বসিয়ে রাখনি? তাঁদের কি প্রচলিত সতীত্বের মাপ-কাঠি দিয়ে মাপতে গেছ? অহল্যার বেলাতেই তোমাদের এই শুচি-বাই কেন!

মহাভারতের দ্রৌপদী-চরিত্র অপূর্ব! অসাধারণ। ওই একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন বলে মহাকবি বেদব্যাস নমস্য হয়ে আছেন আমার কাছে। তিনি তাকে আর্যকন্যা করেন নি। দ্রৌপদী যাজ্ঞসেনী, যজ্ঞের অগ্নিশিখা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল সে। অগ্নি-শিখার মতোই তার মহিমা উদ্ভাসিত করে রেখেছে মহাভারত কাব্যকে। তার তুলনা নেই। ওই কৃষ্ণাঙ্গিনী রূপসী সমস্ত ভারতবর্ষের পুরুষ জাতকে মাতিয়ে তুলেছিল। স্বয়ম্বর সভায় ভারতবর্ষের সমস্ত ক্ষত্রিয় বীরের লোলুপদৃষ্টি পড়েছিল ওই একটি মেয়ের উপর। অর্জুনকে সে বরণ করেছিল, সম্ভবত ভালোও

বেসেছিল। কিন্তু অর্জুনের আর চারটি ভাই যে তার সম্বন্ধে নির্বিকার ছিল তা মনে করবার কোন কারণ নেই। মনে রেখ, পঞ্চ পাণ্ডবরা তখন বিপন্ন। অজ্ঞাতবাস করছেন। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তাঁরা গিয়েছিলেন স্বয়ম্বর সভায়। এ অবস্থায় একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে' যদি পাঁচ ভায়ের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি লেগে যেতো তাহলে যে কাণ্ডটা হতো ইংরেজী ভাষায় তার নাম disaster of the first magnitude, বাংলায় বললে বলতে হয় সর্বনাশ। তাই সম্ভবত কুন্তী বলেছিল, তোমরা পাঁচজনেই ওকে ভোগ কর। অর্জুনকেই দ্রৌপদী ভালোবাসত, এর প্রমাণ সুভদ্রাকে দেখে তার ঈর্ষা হয়েছিল। কিন্তু অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের খুব বেশি উদাহরণ মহাভারতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্যাপারটা ভেবে দেখ। সে ভালোবাসে একজনকে, কিন্তু মুখটি বুজে সমানভাবে ঘর করতে হয় তাকে আর চারজনের সঙ্গেও। প্রণয়ের অভিনয় করতে হয়, একজনের সঙ্গে নয়, চারজনের সঙ্গে। আর এটা করতে হচ্ছে কেন? তার নিজের দায়ে নয়, পারিবারিক অশান্তি নিবারণের জন্যে। যে চওড়া রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, তাকে বাহবা দেবার দরকার নেই, কিন্তু যে দু-হাতে দুটো ছাতা নিয়ে সরু তারের উপর দিয়ে সোজা হেঁটে যাচ্ছে একবারও না পড়ে'—তাকে তুমি বাহবা দেবে না?

কৌরবসভায় দুর্যোধন দুঃশাসনরা যখন তাকে উলঙ্গিনী করবার চেষ্টা করছিল, তখন ভ্রাতৃভক্ত স্বামীদের প্রতি তার উক্তি, আলুলায়িত-কুন্তলা থেকে দুঃশাসন-বধে ভীমকে উত্তেজিত করা, কৃষ্ণ কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে যখন সন্ধির প্রস্তাব করছিলেন, তখন তার তেজোদৃপ্ত প্রত্যাখ্যান—এসব বাদ দিয়েও সে প্রাতঃস্মরণীয়া, কারণ একা মেয়েমানুষ হয়ে পাঁচটা বড় বড় ওয়েলার হর্স জুতে সে বগী হাঁকিয়ে গেছে সবেগে এবং সগৌরবে, একটাও accident না [illegible] একে তুমি বাহাদুরি দেবে না? স্মরণ করবে না?

কুন্তীর সবচেয়ে বড় বাহাদুরি, সে দুর্বাসার মতো দুর্ধর্ষ শঙ্খচূড়কে বশ করতে পেরেছিল। গল্পটা আশা করি জান। কুন্তীর বাবার নাম শূরসেন। তিনি তাঁর প্রথম সন্তান কুন্তীকে (তখন তার নাম ছিল পৃথা) তাঁর পিসতুতো ভাই কুন্তীভোজকে দিয়ে দিয়েছিলেন পূর্ব-প্রতিজ্ঞা অনুসারে। কুন্তীভোজের বাড়িতে মানুষ হয়েছিল বলেই ওর নাম কুন্তী। এই কুন্তীভোজের বাড়িতে মহর্ষি দুর্বাসা একদিন এসে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কুন্তী তখন তাঁর সেবা করেছিল। যে মহর্ষি শকুন্তলার জীবনকে মরুভূমি করে দিয়েছেন, যাঁর রগ-চটা স্বভাবের কাহিনী ত্রিভুবন-বিদিত, যাঁর পান থেকে সামান্য চূণ খসলেই সর্বনাশ, সেই লাইভ ইলেকট্রিক ওঅ্যার (live electric wire) মহর্ষিটিকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিল ওই কিশোরী কুন্তী। এইটেই তো আমার মনে হয় ওর প্রধান কৃতিত্ব আর এরই জোরে ও ওর জীবনের পরবর্তী সমস্যাগুলো (ইংরেজীতে যাকে বলে crisis) সমাধান করতে পেরেছে। সন্তুষ্ট হয়ে মহর্ষি ওকে বর দিলেন—"বৎস, আমি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে এক মহামন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি। এই মন্ত্র পাঠ করে' তুমি যে দেবতাকে আহ্বান করবে, তিনিই তৎক্ষণাৎ এসে হাজির হবেন এবং তোমার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করবেন।"

মহাভারতকার লিখেছেন, কুন্তী প্রথমে ব্যাপারটা ভালো বুঝতে পারে নি। কিন্তু কৌতূহলের বশে মন্ত্রপাঠ করে' সূর্যকে আহ্বান করতেই সূর্যদেব সশরীরে এসে হাজির হলেন। সূর্যকে দেখে ভীত হয়ে পড়ল কুন্তী। হাতজোড় করে বলল—"আমাকে ক্ষমা করুন। মহর্ষি দুর্বাসা আমাকে বর দিয়ে এই মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছেন, মন্ত্র সফল হয় কিনা জানবার জন্যে আমি আপনাকে আহ্বান করেছি!" এরপর সূর্য যা করেছিলেন তা তোমরা সবাই জানো। কর্ণের জন্ম হল। মহাভারতকার লিখেছেন, সূর্যের সঙ্গে

মিলনের সঙ্গে সঙ্গে—তৎক্ষণাৎ কর্ণের জন্ম হল। ঘাবড়ে গিয়ে কুন্তী কর্ণকে ভাসিয়ে দিলে। ব্যাপারটা জানাজানি হল না। এ কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। রামায়ণ মহাভারতে এরকম অনেক আজগুবি কথা আছে। যাই হোক, কিছুদিন পরে স্বয়ম্বর সভায় কুন্তী পাণ্ডুকে বরণ করলেন। অনেকে সন্দেহ করেন পাণ্ডুর কুষ্ঠ ছিল, কিম্বা ধবল ছিল। সেইজন্যে কুন্তী তাঁর বাহুপাশে ধরা দেননি। দূর থেকে ভক্তি করতেন। কিন্তু বংশরক্ষা হয় কি করে? বংশরক্ষা করা আর্যদের এক মহাকর্তব্য। পাণ্ডুর রোগের কথা সম্ভবত কাছেপিঠে রটে গিয়েছিল, তাই পাণ্ডুর জন্যে হস্তিনাপুরের কাছাকাছি দ্বিতীয় কন্যা আর পাওয়া গেল না। ভীষ্ম হস্তিনাপুর থেকে ছুটলেন মদ্রদেশে। সেখান থেকে মদ্ররাজ শল্যের বোন মাদ্রীকে কিনে নিয়ে এলেন। মাদ্রীকে আনবার জন্যে রথ, গজ, তুরগ, বসন, ভূষণ, মণিমুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি শুল্কস্বরূপ দিতে হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের পর মাদ্রীও যখন দেখলেন পাণ্ডুর সাংঘাতিক রোগ আছে, তখন তিনিও পাণ্ডুকে আমোল দিতে চাইলেন না। এ সম্বন্ধে মহাভারতে একটা গল্প লেখা আছে, পাণ্ডু মৈথুন-রত এক মৃগদম্পতীকে নাকি শরাঘাতে মেরে ফেলেছিলেন। সে মৃগদম্পতী কিন্তু আসলে ছিল ঋষি-দম্পতী। তাদেরই অভিশাপে পাণ্ডু নাকি স্ত্রী-সঙ্গ-বঞ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয়, এটা শুধু আজগুবি নয়, অসম্ভব। আসলে পাণ্ডু রোগগ্রস্তই ছিলেন। কারণ যাই হোক—সমস্যা দাঁড়াল বংশরক্ষা হবে কি করে! পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, পুত্র-পিণ্ড প্রয়োজনম্—দু'দুটো ভার্যা মজুত, অথচ পুত্র হবার সম্ভাবনা নেই। তখন ওই কুন্তীই সমস্যার সমাধান করে দিলে। স্বামীকে খুলে বললে সব কথা। পাণ্ডু রাজী হয়ে গেলেন। দুর্বাসা-দত্ত মন্ত্রের জোরে কুন্তী তখন একে একে ধর্মকে, বায়ুকে

এবং ইন্দ্রকে আহ্বান করে' যুধিষ্ঠির, ভীম আর অর্জুনকে সৃষ্টি করলেন। মাদ্রীকেও বঞ্চিত করেন নি তিনি, তাঁর অনুরোধে অশ্বিনীকুমাররা এসে মাদ্রীর গর্ভেও নকুল-সহদেবের জন্মদান করে' গেলেন। একটা মেয়ের পক্ষে এটা যে কত বড় কীর্তি (ইংরেজীতে যাকে বলে achievement), তা কি ভেবে দেখেছ কখনও ? শুধু যে সে সমস্যার সমুদ্র পার হয়ে গেল তা নয়, একেবারে এরোপ্লেনে চড়ে বোঁ করে পার হয়ে গেল। বংশরক্ষার জন্যে ক্ষেত্রজপুত্রের ব্যবস্থা তো অনেকেই করে, কিন্তু তার জন্যে ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্রকে কাজে লাগাতে পারে ক'জন! আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা অমন সব হোমরাচোমরা দিব্যকান্তি দেবতাদের ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে এসেও তাঁদের প্রতি এতটুকু আসক্তি হয়নি কুন্তীর। তাঁদের ব্যবহার করেছে যন্ত্রের মতো। পাণ্ডুর প্রতি কর্তব্য থেকে একচুল সে নড়েনি। এ মেয়েকে প্রাতঃস্মরণীয়া বলবে না তো আর কাকে বলবে ?

এইবার তারা-মন্দোদরীর কথায় আসা যাক। পুরাণে নামজাদা তারা দু'জন আছে। একটি হলো বালীর স্ত্রী, আর একটি হলো বৃহস্পতির স্ত্রী। বালী অনার্য, বড়জোর কনভারটেড (converted) আর্য, আর বৃহস্পতি হলেন দেবগুরু। দু'টি তারাই মহীয়সী মহিলা। এযুগে ওঁরা বেঁচে থাকলে নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর সিনেমা-তারাও হতেন।

প্রথমে বালীস্ত্রীর কথাই বলি। রামচন্দ্র যখন স্বকার্যসাধনের জন্যে সুগ্রীবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে গুপ্তভাবে বালীকে মেরে ফেললেন, তখন তারা সুগ্রীবের প্রেয়সী হয়ে পড়ল। তাকে বিয়ে করেছিল কিনা রামায়ণে লেখা নেই। বালীর তুলনায় সুগ্রীব, ঠিক যেমন হিমালয়ের তুলনায় উই-ঢিবি। বালী অনেক আগেই ওকে

পিঁপড়ের মতো মেরে ফেলতে পারতো, কেবল ভাই বলেই দয়া করে মারে নি। লোকটা এত অপদার্থ ছিল যে, নিজের স্ত্রী রুমাকে পর্যন্ত বালীর কবল থেকে রক্ষা করতে পারে নি। বালী ছিল অমিতবিক্রম বীর বানর একটি। অবশ্য মানুষই ছিল সে, বানর ছিল ওদের টোটেম। বাঙালীদের টোটেম ছিল বোধহয় পক্ষী। আর্য-অনার্যদের যখন ভাব হয়ে যায় তখন এই টোটেমগুলো হিন্দু দেব-দেবীদের বাহন হয়ে পড়ে। তাই মহাদেব ষাঁড়ে চড়েছেন, কার্তিক ময়ূরে, লক্ষ্মী পেচকে, সরস্বতী হাঁসে, গণেশ ইঁদুরে। ওই দেখ, আবার আর একটা বক্তৃতার তোড় এসেছে মনে। এটাকে আর প্রশ্রয় দেব না।

হ্যাঁ, কি বলছিলুম, বালী অমিতবিক্রম বীর ছিল। আধুনিক ভাষায় যাকে হি-ম্যান বলে। দাবড়ে দুনিয়াটা ভোগ করে বেড়াতো। মরালিটির কোন বালাই ছিল না। হি-ম্যানরাই সাধারণত যুবতী স্ত্রীলোকদের হৃদয়-বল্লভ হয়। বালীও তারার হৃদয়-বল্লভ ছিল, বালীর অসংখ্য কুকীর্তি অগ্রাহ্য করে' তারা তাকে যে ভালোবেসেছিল এর অনেক বর্ণনা রামায়ণে আছে।

বালী যখন রেগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায়, তখন তার আকুলি-বিকুলি বারণ থেকে, মৃত্যুশয্যায় শায়িত বালীর বুকের উপর পড়ে তার আকুল কান্না থেকে, হনুমানের সঙ্গে যেভাবে সে বালীর বিষয়ে আলোচনা করেছিল তার থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সত্যিই সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত বালীকে। বালীর মৃতদেহকে আঁকড়ে সে শেষ পর্যন্ত পড়েছিল। রামকে বারবার বলছিল—"যে শর দিয়ে আপনি আমার স্বামীকে বধ করেছেন, সেই শর দিয়ে আমাকেও বধ করুন। আপনি যেমন সীতার বিরহে কষ্ট পাচ্ছেন, আমার স্বামীও তেমনি

স্বর্গে গিয়ে আমার বিরহে কষ্ট পাবেন। স্বর্গের অপ্সরীরাও তাঁর এ বিরহ লাঘব করতে পারবে না। আমাকে বধ করলে স্ত্রীবধজনিত পাপও আপনার হবে না। কারণ, বাইরেই আমি স্ত্রীলোক, আসলে আমি বালীর আত্মা, বালীর কাছেই আমি ফিরে যেতে চাই, আপনি দয়া করে আমাকে বধ করুন। আমি কাঞ্চনমালী, ধীমান, মাতঙ্গগামী বানরশ্রেষ্ঠ বালীকে ছেড়ে থাকতে পারব না, পারব না।”

এর পরই রামায়ণে তারার যে খবর পাই, তা এই—সুগ্রীব স্বীয় পত্নী রুমা ও স্পৃহনীয়া তারাকে নিয়ে দেবেন্দ্রের ন্যায় দিবারাত্রি বিহার করছেন। অর্থাৎ বালীকে পুড়িয়ে এসে তারা সোজা গিয়ে সুগ্রীবের কোলে উঠে বসেছিল। পরে আরও প্রমাণ পাচ্ছি সুগ্রীবের অন্তঃপুরে তারাই সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে। সুগ্রীবের কাছে কোনও দরবার করতে হলে আগে তারার চরণ-বন্দনা করতে হয়। রাজ্যলাভ করে' সুগ্রীব মদ আর মেয়েমানুষে এত মত্ত হয়ে পড়েছিল যে, সে রামকে সীতা-উদ্ধারের জন্যে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা তার আর মনে ছিল না। বর্ষা পেরিয়ে শরৎ এসে গেল, তখনও সুগ্রীবের কোনও সাড়া নেই দেখে খুবই দমে গেলেন রামচন্দ্র। বর্ষায় সীতার বিরহে খুবই কাবু হয়ে পড়েছিলেন তিনি। হনুমান তাঁর অবস্থা দেখে ভদ্রভাবে সুগ্রীবকে তাগাদা দিলেন দু'একবার। কিন্তু তেমন কোনও ফল হলো না। তখন ক্ষেপে উঠলেন লক্ষ্মণ। ধনুর্বাণ হস্তে ধনুকের জ্যা-তে টঙ্কার দিতে দিতে তিনি গিয়ে হাজির হলেন একেবারে সুগ্রীবের অন্দরমহলের সামনে। ভদ্রতাবশতঃ তিনি অন্দরমহলে ঢুকলেন না, কিন্তু অন্দরমহলের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে সিংহনাদে আর্যভাষায় যা বললেন, তাতে সুগ্রীবের নেশা ছুটে গেল, পিলে চমকে উঠল।

অন্তঃপুরের দ্বারদেশে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের সঙ্গে কে দেখা করলো জান? সুগ্রীব নয়, তারা। সন্নতাঙ্গী, স্খলিতগমনা, মদপান-বিহ্বল-নয়না, সুলক্ষণ-সমন্বিতা তারা স্বীয় কাঞ্চীদাম প্রলম্বিত করে' লক্ষ্মণের সন্নিধানে উপস্থিত হলেন। আর্যযুবকরা, তা তিনি যত বড় হোঁৎকাই হোন, সুন্দরী যুবতী দেখলে বেশ ভদ্র হয়ে পড়তেন। 'শিভাল্‌রি' জিনিসটা এখনকার চেয়ে তখন বেশি ছিল। তারাকে দেখে লক্ষ্মণ মোলায়েম হয়ে গেলেন। তারার যুক্তিও মেনে নিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তারারই প্ররোচনায় সুগ্রীবও উৎসাহিত হয়ে মন দিলেন বানর-সৈন্য সংগ্রহে। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, সীতা-উদ্ধার-রূপ দেবকার্যসাধনে তারা কত সাহায্য করেছিল। অতএব দেবভাষায় রচিত সংস্কৃত শ্লোকে তারা প্রাতঃস্মরণীয়া হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি। আর একটা কথাও আমার মনে হয়। যে কবি এই শ্লোকটি রচনা করেছিলেন, তিনি জানতেন যে, রামচন্দ্র মুখে যতই লম্বা বক্তৃতা দিয়ে থাকুন, আসলে বালীবধ কাজটি অন্যায় হয়েছিল তার। তারা যে বালীকে কত ভালোবাসত তা-ও তিনি অনুভব করেছিলেন। তাই মৃত সোলজারের বিধবাকে যেমন বকশিশ দেওয়া হয়, তেমনি তারার নামটাও দ্রৌপদী কুন্তীর সঙ্গে ঢুকিয়ে দিয়ে তার কিছু ক্ষতিপূরণ (compensation) করবার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। আর একটা কথাও মনে হয়। আর্য-অনার্যদের ঝগড়া যখন মিটে গেল, তখন আর্যদের পংক্তিতে অনার্যদের বসাবার একটা রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল সম্ভবত, এখন যেমন আমরা শিডিউল্‌ড্‌ কাস্ট বা হরিজনদের জন্যে বা কোন কোন জায়গায় মুসলমানদের জন্যে সীট রিজার্ভ করে রাখি—ওঁরাও অনার্যদের জন্যে তেমনি রাখতেন। একটা শ্লোকে প্রাতঃস্মরণীয়া পাঁচটি কন্যার নাম দিতে হবে? আচ্ছা, গোটা দুই অনার্যকন্যার নামও থাক।

কিন্তু তারার এই ব্যবহারের কারণ কি! যে বালীর মতো বীরকে সত্যি সত্যি ভালোবেসেছিল সে সুগ্রীবের মতো নপুংসকের মন ভোলাতে গেল কেন? তারার কথা যখন পড়েছিলুম, তখন কার কথা মনে হয়েছিল জান? ক্লিওপেট্রার। বালী যখন মারা গেল তখন তারার আর আপনার লোক কেউ রইল না, তার ছেলে অঙ্গদ ছাড়া। ওই অঙ্গদকেই বড় করা, প্রতিষ্ঠিত করা তার জীবনের লক্ষ্য হয়েছিল তখন। কিন্তু সে লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে সুগ্রীবকে খুশি করতে হয়। ক্লিওপেট্রাও অ্যান্টনির কাছে গিয়েছিল ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে Antioch শিবিরে, সেখানে অ্যান্টনিকে সে বিধিসঙ্গত ভাবে বিয়েও করেছিল, কিন্তু কেন? আমার মনে হয়, সিজারের ঔরসজাত পুত্র সিজারিয়োঁর ভবিষ্যতের জন্যে। বিয়ের যৌতুক হিসেবে রোম সাম্রাজ্যের বেশ বড় একটা অংশও সে আদায় করে নিয়েছিল অ্যান্টনির কাছ থেকে। নূরজাহানও ওই রকম কি একটা যেন করেছিল তার প্রথম পক্ষের মেয়ের জন্যে। এরা যদি জগদ্বিখ্যাত হতে পারে, তারাই বা হবে না কেন?

দ্বিতীয় তারা যা করেছিলেন, তার সঙ্গে তুলনা দেওয়া যেতে পারে হেলেন-হরণের। বৃহস্পতির বউ ছিলেন এই তারা। সোম অর্থাৎ চন্দ্রের সঙ্গে ইলোপ্ (elope) করেছিলেন তিনি। এ নিয়ে তখনকার স্বর্গীয় সমাজে এমন চাঞ্চল্য হয়েছিল যে, প্রকাণ্ড যুদ্ধই বেধে গিয়েছিল একটা, ট্রয়ের যুদ্ধের মতো। স্বয়ং ব্রহ্মা এসে শেষটা মিটিয়ে দেন সব। তারা আবার বৃহস্পতির ঘরে ফিরে এলেন। বৃহস্পতি একটুও আপত্তি করলেন না, তোমাদের মতো ছুঁই-ছুঁই বাতিক ছিল না দেবতাদের। তারা ফিরে এসে পুত্র প্রসব করলেন একটি। ছেলে কার তা নিয়ে গোলমাল বেধেছিল একটু। বৃহস্পতি বললেন, আমার ছেলে, চন্দ্র বললেন

আমার'। তারা যা বললেন তাই শেষে গ্রাহ্য হল। তারা বললেন, ছেলে চন্দ্রের। তার নামকরণ হলো বুধ।

আমার মনে হয়, এ তারা স্মরণীয়া পঞ্চ-কন্যাদের কেউ নন। কারণ, ইনি দেবতাদের বিপদে ফেলেছিলেন, কোনও উপকার করেন নি। উপকার বা খোসামোদ না করলে অনার্স লিস্টে সেকালেও নাম উঠতো না।

রাবণের স্ত্রী, এবং মেঘনাদের মা মন্দোদরীকেও স্মরণীয় পঞ্চ-কন্যাদের মধ্যে ধরা হয়েছে। আমার সন্দেহ হয় ওটা কনসোলেশন্ প্রাইজ। আর একটা সন্দেহও হয়। মন্দোদরী বোধহয় বিভীষণকে ভালোবাসত। কারণ, রাবণের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে মন্দোদরী যে লম্বা বক্তৃতা দিয়েছিল তাতে বিভীষণের সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো কথা অনেকবার আছে। সীতার সুখ্যাতিও আছে। রাম যে নররূপী ভগবান একথাও সে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিল তখন। তাছাড়া রাবণ যে-সব দুষ্কৃতি করেছিল, তারও একটা লম্বা লিস্ট দিয়েছিল সে। এইসব কারণেই সম্ভবত সে ওই অনার্স লিস্টে জায়গা পেয়ে গেল। তাছাড়া, বুড়ো বয়সে স্বামীর শত্রু ঘরভেদী বিভীষণকে বিয়ে করে সে আর্য-আধিপত্যকেই মেনে নিলে। এটাও একটা মস্ত কথা।

কিন্তু একটা কথা, বৎস, সর্বদা মনে রেখ। এরকম পঞ্চকন্যা এযুগেও আছে। মোটে পঞ্চ কেন, হয়তো পঞ্চ সহস্র আছে। সব যুগেই ওরা থাকে। আমি আমার ডাক্তারি জীবনে এরকম পাঁচটি কন্যাকে দেখেছি। এই আধুনিক পঞ্চকন্যার পরিচয়ও তোমাকে দিচ্ছি, অবশ্য তাদের নামধাম গোপন করে। আর্যরা যেমন motive থেকে পাপপুণ্যের বিচার করতেন, এদের সম্বন্ধেও তাই যদি কর, তাহলে দেখতে পাবে এরাও কম নয়।

বহুকাল আগে, তখন আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে অগ্নিযুগ চলছে, একটি পরিবারের সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। পরিবারটি ছিল একটু ব্রাহ্ম-ঘেঁসা, তাই বাড়ির প্রত্যেকটি মেয়েদের নামের সঙ্গে একটি করে 'সু' জুড়ে দিয়েছিল। সুমতি, সুনন্দা, সুষমা, সুছন্দা—এই চারটি মেয়ে ছিল ভদ্রলোকের। পাড়ার দুষ্টু ছেলেরা আড়ালে এদের নামকরণ করেছিল—গল-গল, টল-মল, ঢল-ঢল আর জ্বলজ্বল। সব কটি মেয়েই সুন্দরী, চলনে বলনে হাবভাবে মোহিনীও। প্রথম তিনটি মেয়ের টপটপ করে বিয়ে হয়ে গেল, সব লভ্ ম্যারেজ। হলো না কেবল সুছন্দার, যার ডাকনাম ছেলেরা দিয়েছিল জ্বল-জ্বল। সেই সবচেয়ে বেশি সুন্দরী ছিল। ছিপছিপে গড়ন, ধপধপে ফরসা রং, চোখের তারা মিশ কালো, মনে হতো দু' টুকরো কালো ভেলভেট যেন কেউ বসিয়ে দিয়েছে চোখের ভিতরে। কখনও কারও দিকে চোখ তুলে চাইতো না। যখনই তাকে দেখেছি, ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে' বসে বই পড়ছে। ভাবতাম, নভেল নাটক পড়ে বুঝি। একদিন তার জ্বর হল, দেখতে গেলুম। গিয়ে দেখি শুয়ে শুয়ে পড়ছে। জিগ্যেস করলুম, কি বই পড়ছো ওটা। মুচকি হেসে বইটা পাশে রেখে দিলে। উল্টে দেখলুম, গ্যারিবল্ডির জীবন-চরিত। একটু আশ্চর্য হয়ে গেলুম। ওই তপ্ত-কাঞ্চন-সন্নিভা নবোদ্ভিন্নযৌবনা তন্বীর এ কি মতিচ্ছন্ন! মেয়েটি কলেজে পড়তো। জিগ্যেস করলুম—ইংরেজি পোয়েট্রি কি কি বই পড়া হয় তোমাদের। বললে—শেলী, কীট্‌স আর মিলটন। বললাম, "তাই পড় ভালো করে। ওসব ছেড়ে এই কাঠখোট্টা বই পড়ছ কেন?" মেয়েটি যা উত্তর দিলে তাতে ঘাবড়ে গেলুম। বললে—'এদের জীবনী না পড়লে ওসব কবিতার মানে স্পষ্ট হয় না।' মনে হলো মেয়েটি একেবারে খরে' গেছে। সেকালে নিরামিষ খেয়ে টিকি রেখে একদল কলেজের ছোকরা ধর্ম-ধ্বজী

হবার চেষ্টা করতো। কুসংস্কারগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিত। টিকি ইলেক্‌ট্রিসিটির কণ্ডাক্‌টার, পাটের কাপড় পরলে মন্দ লোকের দুষ্ট দৃষ্টির ইলেক্‌ট্রিসিটি সাধনায় ব্যাঘাত জন্মাতে পারে না, সূর্যগ্রহণের সময় ভাতের হাঁড়িতে ব্যাক্‌টিরিয়া জন্মায়, এই রকম অনেক কিছু বলতো তারা। এই ধরণের ভুয়ো স্বদেশী ছেলে-মেয়েও হয়েছিল একদল। তারা বাইরে 'পোজ' করতো যেন তারা অনুশীলন সমিতির সভ্য। আমি মনে করলুম, এই মেয়েটি শেষোক্ত দলের। আড়ালে তার বাপ-মাকে বললুম, মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিন। তাঁরা বললেন, আমরা চেষ্টার ত্রুটি করছি না, কিন্তু মেয়ে যে পছন্দ করছে না কাউকে। সত্যিই দেখলুম তাদের বৈঠক-খানায় হরেক রকমের চিড়িয়া আমদানি হচ্ছে, কিছুদিন করে থাকছে, আবার চলে যাচ্ছে। ঢিলে-পাজামা-পরা মোটা কালো এক ভদ্রলোক ছিনেজোঁকের মতো লেগেছিলেন অনেক দিন। তাঁর অগাধ পয়সা, কোলকাতায় বাড়ি, বড় পদস্থ চাকরে একজন —কিন্তু তার দিকে ফিরেও চাইলে না সুছন্দা। তিনি সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিত এসে ধরনা দিতেন। সুছন্দা তাঁর দিকে ফিরেও চাইত না। ঈষৎ ভুরু কুঁচকে বই পড়ে যেত খালি। মাঝে মাঝে বাঁ হাত দিয়ে কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিত। একটি কথা বলত না, একবার চোখ তুলে চাইত না। ভদ্রলোক হাল ছেড়ে দিলেন শেষে। তারপর এলেন প্যাঁশনে চশমা-পরা বাবরি-ওলা এক কবি। তারপরে এলো এক গাঁট্টাগোঁট্টা ফুটবল খেলোয়াড়। আধুনিক স্বয়ম্বর সভা বসতে লাগল তাদের বৈঠকখানায় এইভাবে। মেয়েটা পালাল শেষটায় একদিন। খোঁজাখুঁজি হলো, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো, যথাবিধি যা যা হওয়া উচিত সবই হলো। কিন্তু সুছন্দা আর ফিরল না। আমিও দিনকতক পরে বদলি হয়ে গেলাম কোলকাতা থেকে।

প্রায় বছর দুই পরে সন্ধ্যার পর একদিন নিজের কোয়ার্টারে বসে আছি, এমন সময় হাসপাতাল থেকে খবর এল, একটি স্ত্রীলোক আমার সঙ্গে দেখা করবে বলে বসে আছে। অনুমতি পেলে সে আমার কোয়ার্টারেই আসবে। অনুমতি দিলুম। কে এল জান? সেই জ্বল-জ্বল। প্রথমটা চিনতে পারিনি। বেশ মোটা হয়েছে, চোখের কোলে কালী। পরনের কাপড়খানা রঙীন যদিও, কিন্তু বেশ ময়লা। আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলুম তার দিকে খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ চিনতে পারলুম।

"আরে, এ কি সুছন্দা যে—!"

সাধারণ মেয়ে হলে চোখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত এর পর। কিন্তু সে সন্নত দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। তারপর স্থির মৃদুকণ্ঠে বললে—"খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি কোথা আছেন তা খুঁজে বার করতেই কিছু সময় গেছে আমার। আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন?"

"বিপদটা কি শুনি আগে—"

"আমি সন্তান-সম্ভবা"

"সে কি!"

তখন তার দিকে ভালো করে' চেয়ে দেখলুম। পেটের কাছটা একটু উঁচু বলেই মনে হলো।

বললাম, "চল, পরীক্ষা করে দেখি—"

দেখলাম নদ্‌পদে পোয়াতি। মাসখানেকের মধ্যেই ছেলে হবে।

"কি ব্যাপার! কবে বিয়ে হলো তোমার—"

"বিয়ে হয় নি।"

"তবে?"

চোখ নীচু করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সুছন্দা। তারপর বললো, "ধরে নিন ভ্রষ্টা হয়েছি।"

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, "তাই আপনার কাছে এসেছি।"

রোমাঞ্চিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম তার মুখের দিকে চেয়ে। আনন্দে নয়, ভয়ে। বৈঠকখানার সোফায় বসে বলা চলে—'সিংহকে আমি থোড়াই কেয়ার করি'। কিন্তু সত্যি সত্যি সিংহের সম্মুখীন হলে প্রত্যেকের যা অবস্থা হয় আমারও তাই হল।

একটু চুপ করে থেকে জিগ্যেস করলুম, আমাকে কি করতে হবে? ছেলেটা প্রসব করিয়ে দেওয়া?"

"তা যদি দিতে পারেন তাহলে ভালোই হয়। কিন্তু আমি সেজন্য আসিনি। আমি অন্য একটি অনুরোধ নিয়ে এসেছি"

"কি বল—"

"আমার যদি জ্যান্ত ছেলে হয়, তাহলে সে ছেলের ভার আপনাকে নিতে হবে। আপনার জানাশোনা অনেক অনাথালয় নিশ্চয় আছে। সেইখানে কোথাও দিয়ে দেবেন—"

"তুমি নিজের ছেলের ভার নেবে না কেন?"

"নেবার উপায় নেই বলে।"

"একথাটা কি আগে ভাবা উচিত ছিল না?"

"ভেবেছিলাম। সাবধানতাও অবলম্বন করেছিলুম। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিপদে পড়ে গেছি।"

কি বলব, চুপ করে রইলাম খানিকক্ষণ।

তারপর বললুম—"এত লোক থাকতে তুমি আমার কাছে এলে কেন?"

"কারণ আমি আপনাকে চিনি।"

এই বলে চোখ নীচু করে মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল। কি করি, মহামুশকিল। জিগ্যেস করলাম—"তোমার বাবার খবর কি—"

"কাগজে দেখেছি তিনি রায়বাহাদুর হয়েছেন। আর কোন খবর জানি না।"

চোখ নীচু করে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু হাসবার চেষ্টা করে বললুম—"তুমি আমাকে যে ভার দিতে চাইছ তা যদি না নিতে পারি?"

"আমি জানি আপনি নেবেন। আর নিতান্তই যদি তাড়িয়ে দেন, চলে যাচ্ছি। অন্য কোন হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হব। তারপর ছেলে হলে ছেলেটাকে ফেলে পালিয়ে যাব। তাঁরা যা হয় ব্যবস্থা করবেন। ছেলের ভার নেবার আমার উপায় নেই।"

"তাহলে ওকে রক্ষা করবার চেষ্টাই বা করছ কেন?"

সুছন্দা হঠাৎ চোখ তুলে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল মুহূর্তকাল। তারপর স্থিরকণ্ঠে বললে,—"কে জানে, ও কর্ণও তো হতে পারে—"

আমি মুখে যদিও বললুম, "কেন, সূর্যের সঙ্গে দেখা হয়েছিল না কি"—কিন্তু মনে মনে আশ্চর্য হয়ে গেলুম ওর সাহস দেখে।

"তা ঠিক জানি না। হতেও পারে—"

"সব খুলে বল দিকি—"

"আমি কিচ্ছু বলতে পারব না। বানিয়ে মিছে কথা বলতে পারি। কিন্তু আপনার কাছে তা বলব না। আর এমনিতেই মিছে কথা আমি বড় একটা বলি না—"

অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম তার মুখের দিকে।

"আমার অনুরোধটা রাখবেন না?"—আবার বললে সে।

এরপর আমি আর 'না' বলতে পারলুম না। ভর্তি করে নিলাম হাসপাতালে। বেশি ভুগতে হয়নি। দিন কয়েক পরে একটা মরা ছেলে প্রসব করল সে। তারপর হঠাৎ একদিন চলে গেল কাউকে কিছু না বলে'।

অনেকদিন ওর আর কোনও খবর পাইনি। বোধহয় বছর দুই হবে। তখনও আমি সেই হাসপাতালেই আছি। হঠাৎ একদিন দুপুরে একটা রেড-ক্রসের মোটরকার দাঁড়াল এসে হাসপাতালে। তার থেকে নাবল একটি স্ট্রেচার। স্ট্রেচারে চাদর-ঢাকা-দেওয়া রোগী একটি। আমার এ্যাসিস্টেণ্ট সার্জনই দেখেছিল তাকে প্রথমে। সে এসে আমাকে বললে—রোগীটি স্ত্রীলোক, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। গিয়ে দেখি সুছন্দা! দুটো পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত, সর্বাঙ্গে ঘা, চোখ দুটো টকটকে লাল। সিফি-লিসের ভয়াবহ পরিণাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, "সুছন্দা, এ কি কাণ্ড—?"

"আপনার কাছে মরবার জন্যে এসেছি। আমার আর বাঁচবার দরকারও নেই। আমি আমার জীবন দিয়ে যতটুকু করবার তা করেছি। আপনার কাছে এসেছি আর একটা অনুরোধ নিয়ে। আমার সঙ্গে ছোট একটা স্যুটকেশ আছে। সেটা আপনি আপনার কাছে রেখে দিন। খগেন নামে আমার এক বন্ধু ওটি নিতে আসবে। এলে তাকে দিয়ে দেবেন। তার ডান গালে একটা কালো জড়ুল আছে।—"

যদিও তার অবস্থা দেখে মনে মনে আমি খুব দমে গিয়েছিলুম, কিন্তু সব ডাক্তারের যা করা উচিত আমিও তাই করলুম। মুখে তাকে আশ্বাস দিলুম।

"ঘাবড়াচ্ছ কেন, ভালো হয়ে যাবে তুমি।"

তার দৃষ্টিতে যেন একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল। পরে বুঝলাম, ওই স্যুটকেশটা আমার হাতে দেবার জন্যেই সে এসেছিল, চিকিৎসা করাবার জন্যে নয়। চিকিৎসা করবার সুযোগই সে দেয়নি আমাকে। সেই রাত্রেই সায়ানাইড খেয়ে মারা গিয়েছিল।

স্যুটকেশটা অনেকদিন পড়েছিল আমার কাছে। সেটা খুলেও

দেখেছিলাম আমি। আশা করেছিলুম রঙীন-কাগজে-লেখা এক বাণ্ডিল প্রেমপত্র পাব। কি পেলুম জান? দুটো রিভলভার। মাস ছয়েক পরে গালে-জড়ুল-ওলা সেই ছোকরা এল। তাকে জিগ্যেস করলুম—

"আপনার নাম কি?"

"খগেন।"

"সুছন্দার স্যুটকেশটা নিতে এসেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"কি আছে ওতে জানেন?"

"বোধহয় ওর জামা-কাপড় কিছু। ওর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে বলেছিল—"

"স্যুটকেশের ভিতর দুটো রিভলভার আছে। সব কথা যদি খুলে না বলেন, তাহলে আপনাকে পুলিশে দেব।"

যুবকটি বললে, "ভয় দেখিয়ে আমার কাছে কিছু আদায় করতে পারবেন না, কারণ আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি। পুলিশের লোক এসে পৌঁছবার আগেই আমার মৃতদেহটা আপনার মর্গে পৌঁছে যাবে।"

"বেশ, তাহলে ভয় দেখাব না। সুছন্দাকে আমি শ্রদ্ধা করতুম। তাই, ব্যাপারটা কি জানবার খুব কৌতুহল হচ্ছে। তার সম্বন্ধে মনে মনে যে ছবি এঁকে রেখেছিলুম, এ ঘটনাগুলোতে সেটা কেমন যেন বিশ্রী হয়ে গেল। তাই জানতে চাইছি—"

"আপনাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না, আপনি একজন গভর্নমেণ্ট অফিসার! সুছন্দা যখন প্রথমে আপনার কাছে এসেছিল, তখন সে নিশ্চয় কিছু বলে নি।"

"না। কিন্তু তার সম্বন্ধে যে কুৎসিৎ ধারণাটা হয়েছে, সেটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারলে খুশী হতুম। কিন্তু আপনি যদি না

বললেন তাহলে আর উপায় কি। আমি যে গভর্নমেণ্ট অফিসার সে কথাও অস্বীকার করব কি করে'। তবে একটা কথা মনে রাখবেন— all that glitters is not gold—আমি আপনাদের মতোই সাধারণ লোক। রাজহংসদের মধ্যে আছি বটে, কিন্তু আমি বক ছাড়া কিছু নই। একটু দাঁড়ান, এনে দিচ্ছি আপনাকে স্যুটকেশটা। চা খাবেন ?"

আমার কথাবার্তা শুনে ছেলেটি যেন একটু নরম হল।

চা খেতে খেতে সে জিগ্যেস করল—"সুছন্দার সম্বন্ধে কি ধারণা হয়েছে আপনার ?"

"যে ধারণা অনিবার্য তাই হয়েছে। খুব ভদ্রভাষায় বললেও বলতে হয়, মনে হয়েছিল সে অসংযত জীবন যাপন করতো—"

"সে দেহ-বিক্রি করে টাকা রোজগার করতো। সংযম অসংযমের কোনও প্রশ্নই ছিল না। সেই টাকা সে নিজের জন্যে খরচ করত না কখনও, সে টাকা জমিয়ে রিভলভার কিনত চোরাবাজার থেকে। আমি সে রিভলভার নিয়ে তৃতীয় ব্যক্তিকে দিয়ে আসতাম। তিনি আবার অন্য উপায়ে সেগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দিতেন। ওর কেনা রিভলভারের গুলিতে অনেক নামজাদা সাহেব মারা গেছে। কিন্তু সে কথা কেউ জানে না। জানবেও না। নিজেকে ও সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করে' রাখত। আমি ছাড়া আর কেউ জানে না এ কথা। ওর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলুম, ওর এ পরিচয় কারো কাছে বলব না। আজ প্রথম আপনার কাছে বললুম—"

"আপনার সঙ্গে ওর পরিচয় কি সূত্রে হয়েছিল ? জানতে পারি কি ?"

"আমরা সহপাঠী ছিলাম। ও পড়ত বেথুনে, আমি স্কটিশে। ওর রূপ দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, যেচে গিয়ে আলাপ করেছিলাম। তারপর ক্রমশ ওর আসল পরিচয় পেলাম।"

হঠাৎ ছেলেটির চোখ থেকে টপ টপ করে জল ঝরে পড়ল কয়েক ফোঁটা। তার পরই টপ করে উঠে পড়ল সে। স্যুটকেশটা নিয়ে চলে গেল। আমি নির্বাক হয়ে বসে রইলাম।

আমি তো এ মেয়েকে দ্রৌপদী কুন্তীর চেয়ে ঢের বেশি উচ্চাসনে বসিয়ে রেখেছি।

দ্বিতীয় যে কন্যাটির কথা মনে পড়ছে, সেটি একটি বাগ্দির মেয়ে। আমরা ভদ্রলোকরা যাদের ছোটলোক বলি তাদের মেয়েদের যৌবনোদ্গম লক্ষ্য করেছ কখনও? দেখবার মতো জিনিস একটা। ওরা ধুলোয়-কাদায় রোদে-জলে মোটা খাবার খেয়ে প্রকৃতির কোলে মানুষ হয়, তাই ওদের রূপও প্রকৃতিদত্ত। সতেজ, সবুজ, প্রাণরসে টল-মল, কিশোরী লতার মতো, বন্য-হরিণীর মতো। ওরা রুজ পাউডার মেখে ওদের রূপের গালিচায় তালি দেবার চেষ্টা করে না। সে দরকারই হয় না ওদের, মত্ত মাতঙ্গদের যেমন দরকার হয় না শুঁড়ির দোকান থেকে মদ কেনবার। এদের দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন সেকালের তন্ত্রকারেরা। এই অপরাজিতাদের তাঁরা সাধন-সঙ্গিনী করবারও উপদেশ দিয়েছেন। নীচ-কুলোদ্ভবা বলে ঘৃণা করেন নি। কবি বাণভট্ট তাঁর কাদম্বরী কাব্যে চণ্ডালকন্যার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার থেকে মনে হয়, এই অনার্যকন্যারা (যাদের আমরা ছোটলোক বলি) সেকালে আর্যদের সভাতেও মোটেই অপাংক্তেয় ছিল না। বাণভট্ট লিখেছেন—সেই চণ্ডালকন্যার কেশদাম বর্ষার জলভরা মেঘের মতো, চোখ দুটি যেন শরতকালের বিকশিত পুণ্ডরীক, অনঙ্গদেবের মতো তার কটিদেশ মুঠোর মধ্যে ধরা যায়। তাকে দেখে মনে হয়, নীলপদ্মবনে সন্ধ্যার রক্তরাগ যেন ছড়িয়ে পড়েছে। আমি যে বাগদির মেয়ে পদ্মাবতীর কথা বলছি, আমার বিশ্বাস, বাণভট্ট তাকে দেখলেও মুগ্ধ হতেন এবং যে ভাষায় তার

বর্ণনা করতেন তার উপমা-অলঙ্কার-বিশেষণের জৌলুসও বিদগ্ধ রসিকদের চিত্ত হরণ করত।

পদ্মাবতী আমার কাছে যখন এল তখন তার গণোরিয়া হয়েছে। একথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, আউটডোরে রোগীর ভীড়ে তার দিকে আমার নজর গিয়েছিল সে অসামান্যা রূপসী বলে'। কালো মেয়ের অত রূপ এর আগে চোখে পড়ে নি। মহাভারতের কৃষ্ণাকে কল্পনায় দেখেছিলাম। পদ্মাবতীকে দেখে মনে হল, সেই কৃষ্ণাই সশরীরে এসে হাজির হল নাকি?

ওরকম একটা নারীরত্ন দাগী হয়ে গেছে দেখে কষ্ট হল খুব। সে যুগে গণোরিয়ার সুচিকিৎসা আমার যতটা জানা ছিল তা করলাম। ফলে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলো একটু। অর্থাৎ আমি ক্রমশ সেই পর্যায়ে গিয়ে পড়লুম যে পর্যায়ে গেলে মুরুব্বীর মতো উপদেশ দেওয়া চলে।

তাকে একদিন জিগ্যেস করলুম—"এ বিশ্রী রোগ তোমার হলো কি করে? তোমার স্বামী কি দুশ্চরিত্র লোক?"

"খুব। দিনরাত তাড়ি খেয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু এ রোগটি ওর কাছ থেকে হয় নি—মিথ্যে কথা বলব না আপনার কাছে ডাক্তারবাবু—"

একটু অবাক হয়ে গেলুম। এমন একটা দুশ্চরিত্র স্বামীর ঘাড়ে দোষটা চাপাবার সুযোগ ও অনায়াসে ত্যাগ করল! আশ্চর্য তো।

"কি করে হ'ল তাহলে—"

ঘাড় নীচু করে মুচকি হেসে বলল,—"ওই যে আমাদের জমিদারবাবুর বড়ছেলে শুকদেববাবু, চেনেন না তাঁকে, ওই যে বড় ফিটনে চড়ে রোজ মাছ ধরতে যায়, আপনাদের হাসপাতালের সামনে দিয়েই তো যায়—"

শুধু যে সরলভাবে কথাটা স্বীকার করলে তা-ই নয়, এটা যে

খুব একটা গুরুতর অন্যায় কাজ করেছে সে-বোধও যেন নেই—এইটে আমার মনে হল ওর বলবার ধরণ থেকে। ও যেন লুকিয়ে কারও গাছ থেকে পেয়ারা চুরি করে' খেয়েছে কিম্বা কারো ভাঁড়ার থেকে আচার চুরি করে' খেয়েছে—ভাবটা অনেকটা এই রকম। আমি বাঙালী, সুতরাং আমার মধ্যে সেই আদ্যিকেলে পদিপিসি আছে। পিসি উপদেশ দেবার জন্যে খোঁচাতে লাগল আমাকে।

বললাম, "কাজটা খুব খারাপ করেছ। এ কাজ কেন করতে গেলে? টাকার জন্যে?"

"ছি ছি, ওকি বলছেন? আমি বাজারের মেয়েমানুষ নাকি? একটি পয়সা নিই নি ওর কাছে—"

"তাহলে এ পাপ কাজ করতে গেলে কেন। অভাবে পড়ে' করলে তবু একটা মানে বোঝা যেতো—"

মেয়েটা ঘাড় হেঁট করে' বসেছিল। ঘাড় হেঁট করেই রইল। আর কিছু বলল না।

কিন্তু আমার অন্তরনিবাসিনী পদিপিসি তখন এর হাঁড়ির খবরটি জানবার জন্যে খুব উৎসুক হয়ে পড়েছেন। সুতরাং আমাকে থামতে দিলেন না। আমি একজন পদস্থ ডাক্তার, আর ও একটা সামান্য বাগ্দির মেয়ে একথা ভুলিয়ে দিলেন আমাকে।

জিগ্যেস করলুম—"ওকে ভালোবাস নাকি—"

পদ্মাবতী মাথা নেড়ে জানাল বাসে না।

"তবে?"

হঠাৎ সে মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে বললে—"আপনারা কি ভিখিরিকে ভিক্ষে দেন না কখনও?"

এইবার চুপ করে যেতে হল আমাকে। এ উত্তর প্রত্যাশা করি নি।

যতদিন ওখানে ছিলুম, খোঁজ রাখতুম মেয়েটার। যিনি ফিটন

হাঁকিয়ে রোজ মাছ ধরতে যেতেন, সেই শুকদেববাবুর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল পরে, তাঁর গণোরিয়া এবং সিফিলিস চিকিৎসা করবার জন্যে। অনেক টাকা কামিয়েছিলুম তাঁর কাছ থেকে। ভাগ্যে এই অকালকুষ্মাণ্ড বড়লোকের ছেলেগুলো আছে তাই আমরা ডাক্তাররা, দুপয়সা করে' খাচ্ছি। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর আর দাদের চিকিৎসা করে' ক'পয়সা পেতুম। টি-বি হয় খুব গরীবদের। এ দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা তারা করাতে পারে না। বড়লোকরা স্যানাটোরিয়মে চলে যায়। সিফিলিস গণোরিয়াই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। শুকদেবের সঙ্গে যখন অন্তরঙ্গতা হল, তখন তাকে পদ্মাবতীর কথা জিগ্যেস করেছিলুম। বলা বাহুল্য, পদিপিসির ওস্‌কানিতে।

শুকদেব বললেন, "জীবনে ওই একটি মেয়ের কাছেই হাত-জোড় করেছিলুম। এখনও হাতজোড় করেই আছি। একবার সে দয়া করেছিল, দ্বিতীয়বার আর করেনি। মনে হয়, আর করবেও না। আমার ধারণা কি জানেন?"

"কি?"

"ও গরীবের ঘরে জন্মালে কি হবে, মেয়েটি সত্যিই অসাধারণ। যে স্বামী দুবেলা ঠেঙিয়ে ওর গতর চূর্ণ করে দিচ্ছে, সেই স্বামীর পা আঁকড়ে পড়ে আছে মশাই। শুধু আমি নয়, অনেকেই ওকে রাজরাণী করে রেখে দিতে প্রস্তুত, ও কিন্তু রাজী হয় না। আমার ধারণা, হয় ও কোনও শাপভ্রষ্টা অপ্সরা, কিম্বা খুব গভীর জলের মাছ, আমাদের মতো লোকের জাল সেখানে পৌঁছয় না।"

আর একবার পদ্মাবতীর চূর্ণ-গতর মেরামত করবার সুযোগ পেয়েছিলাম কিছুদিন পরে। তাকে দেখে মনে হয়েছিল, যেন একটা উন্মত্ত ষাঁড়ে তাকে গুঁতিয়েছে। তার স্বামী বিশু বাগ্‌দিকেও দেখবার সুযোগ হয়েছিল সেই সূত্রে, কারণ পদ্মাবতী তার হাতে কামড়ে

দিয়েছিল। কামড়ে না দিলে বিশু বাগ্‌দি সম্ভবত খুনই করে ফেলতো তাকে। কারণ, সে ছিল মনুষ্যরূপী একটি মহিষাসুর। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া, তেমনি জোয়ান, ইয়া গোঁফ, ইয়া জুলফি।

এরপর আমি বদলি হয়ে গেলাম সেখান থেকে। নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে অবশেষে একটা কুষ্ঠ হাসপাতালে গিয়ে ঠেকলুম প্রায় বছর দশেক পরে। ওপরওলার সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছিল একটু, তিনি আমাকে ওই ভাগাড়ে পাঠিয়ে দিলেন। বছরখানেক সেখানে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। একটি পরম লাভ হয়েছিল কিন্তু। পদ্মাবতীর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল সেখানে। একদিন আউটডোরে এসে দেখি, একটা একচোখ কানা বুড়ি বসে আছে। পদ্মাবতীকে আমি চিনতে পারিনি প্রথমে। সে উঠে এসে যখন ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে, তখন জিগ্যেস করলাম, "কে তুমি—"

"চিনতে পারছেন না ডাক্তারবাবু, আমি পদ্ম—"

অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম তার দিকে। তার যে চোখ দেখে বাণভট্টের সৃষ্টি পুণ্ডরীকনয়নার কথা মনে পড়েছিল, সেই চোখের একটি নেই। যেটা আছে সেটাও বীভৎস হয়ে উঠেছে সঙ্গীহীন হয়ে! বাঁ গালের উপর, কানা চোখটার নীচেই 'স্কার' একটা, গালের মাংসটাকে কুঁচকে দিয়েছে। মনে হচ্ছে যেন মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। সেই ঢলঢলে মুখের শোভা একটুও নেই।

"একি, এরকম চেহারা কি করে হল তোমার? চোখটা গেল কি করে?"

"ওই ওকে জিগ্যেস করুন। মদের ঝোঁকে আমার মুখের উপর আগুনের নুড়ো চেপে ধরেছিল!"

"কিন্তু এখন যা হয়েছে, তা তো চিকিৎসার বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে যদি আসতে—"

"আমি এর জন্যে আসি নি। আমার পায়ের হাঁটু দুটোর যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি, সে জন্যেও আসি নি, আমি ওর জন্যেই এসেছি। আপনি ওকেই দেখুন ভালো করে' ওর একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা করে' দিন। আপনি পুরোনো চেনা লোক, এখানে আছেন ভালোই হয়েছে—ওকে দেখুন একবার—"

বিশু বাগ্দি এককোণে গায়ে কাপড়চোপড় ঢাকা দিয়ে বসেছিল, তখনও ভালো করে দেখিনি তাকে।

"এদিকে এস, দেখি কি হয়েছে—"

তাকে দেখেও চমকে উঠলুম। বন্যমহিষ যেন মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা-গাড়ি-টানা মহিষে পরিণত হয়েছে। তার মুখের দিকে এক নজর চেয়েই বুঝলাম কি হয়েছে তার। কুষ্ঠ। ওই ফোলা-নাক, ফোলা কানের পাতা, ওই সিংহবদন আর কোন রোগে হয় না।

পদ্মাবতী বললে, "আমার গয়নাগাঁটি সব বিক্রি করে চল্লিশটি টাকা জোগাড় করে এনেছি ডাক্তারবাবু। দরকার হলে বাজার থেকেও ওষুধ কিনতে পারব আমি—"

বিস্ময়ের ঘোরটা কাটতে মিনিটখানেক লাগল। তারপর ব্যবস্থা করে দিলুম। বেহুলা সাবিত্রী রূপবান চরিত্রবান স্বামীদের যমের কবল থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে অশেষ কৃচ্ছ্র সাধন করেছিলেন বলে তাঁদের আমরা বাহবা দিই। কিন্তু পদ্মাবতীর এই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত শয়তান পাষণ্ড স্বামীকে বাঁচাবার আকুল আগ্রহ কি ওদের আগ্রহের সঙ্গে তুলনীয়? তোমার ক্ল্যাসিক্যাল পঞ্চকন্যাদের চেয়ে এ কি কোনও অংশে কম?

এইবার তৃতীয় যে কন্যাটির কথা বলব, তাকে তোমরা সবাই দেখছ, কিন্তু চিনতে পার নি। এ কন্যা মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে ঘরে আছে। এরা অনাহারে বা অর্ধাহারে থেকে, বছরের পর বছর

তোমাদের খেয়াল অনুসারে মন যুগিয়ে দিনের পর দিন শরীর পাত করছে, কিন্তু এদের তোমরা চেনও না, শ্রদ্ধাও কর না। মাঝে মাঝে কেউ কেউ হয়তো সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে হাততালির লোভে ওদের সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছ, কিন্তু ওদের সত্যিকার মর্যাদা তোমরা দাওনি, দেবার সামর্থ্যও তোমাদের নেই। ওই সতী-লক্ষ্মীরা তোমাদের বাড়িতে কুমারী অবস্থাতেও চাকরাণী-রাঁধুনী, সধবা অবস্থাতেও তাই, আর বিধবা হলে তো কথাই নেই। তখন তার খাবারের এক-আধটুকুরো মাছ আর তার কাপড়ের পাড়ের সামান্য রংটুকুও তোমরা মুছে নিয়ে তাকে একবেলা খাইয়ে উপদেশ দাও—'এখন কেবল পতিদেবতার চরণ ধ্যান কর, নির্বিকার হয়ে আমার সংসারের বাসন মাজ, কাপড় কাচ আর রান্না করে যাও। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছেঁটে ফেল। রূপে, রঙে, গানে, কবিতায় খবরদার মুগ্ধ হয়ো না। অবসর পেলে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ শুনতে পার। ওসবেও নানা রকম অশ্লীল গল্প আছে বটে, কিন্তু ধর্ম্মরসে জারিত হয়ে নির্দোষ হয়ে গেছে সে সব। ফর্মালিনে-ডোবানো মরা-গোখরো কামড়ায় না। কাঁচা তেঁতুল খেলেই অসুখ হবার সম্ভাবনা, কিন্তু পুরোনো পোকাধরা তেঁতুল ঔষধ পথ্য দুই-ই। সুতরাং সংসারের কাজকর্ম সেরে বিনা পয়সায় কোথাও রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ শোনবার সুযোগ পেলে শুনো।' তাই করছে তারা।

এই শ্লেভ, ট্রেড (slave trade) তোমরা চালিয়ে যাচ্ছ অনাদি কাল থেকে। কোনও আইন তোমাদের রুকতে পারে নি। কারণ ওই শ্লেভরাই স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তোমাদের চাবুকের তলায় পিঠ পেতে দিচ্ছে। দিচ্ছে, কারণ ওই দেওয়াটাকেই ওরা পুণ্য মনে করছে, বহুকালের সংস্কারের জগদ্দল পাথরের তলায় চাপা পড়ে নিষ্পিষ্ট হয়ে গেছে ওদের স্বাধীন সত্তা, ক্রীতদাসী হয়েই কৃতার্থ

ওরা। মানছি, ওদের মধ্যে অনেক খাণ্ডারণী আছে। এ-ও মানছি ওদের ভয়ে অনেক স্বামীও সন্ত্রস্ত। ইতিহাসে এ নজীরও আছে যে ইংরেজরা প্রথম যখন এদেশে আসে, তখন এদের মধ্যে থেকেই একদল তাদের কাছে আবেদন জানিয়েছিল যার সারমর্ম হচ্ছে—আমাদের বাঁচাও। তোমরা শুনেছি সভ্য দেশের লোক, এই পিশাচ পাষণ্ডদের হাত থেকে বাঁচাও আমাদের। সংসারের চাপে নিষ্পিষ্ট হলেও সকলের স্বাধীন সত্তা একেবারে মরে যায় না, নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে তা। কিন্তু এ-ও ঠিক যে, এখনও ওই মধ্যবিত্ত সংসারেই লক্ষ লক্ষ নারী 'মূঢ় ম্লান মূক মুখে' তোমাদের দাসীবৃত্তি করে চলেছে। আত্মবিলোপ করেই ওদের তৃপ্তি।

আমি একটি মেয়ের কথা জানি। একটা বুড়ো কেরানীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। অপূর্বচন্দ্র আমারই আপিসের কেরানী ছিল। বেগুনপোড়ার মতো মুখটা, তার উপর একজোড়া সাদা ঝোলা গোঁফ। চোখ দুটো ফোলা-ফোলা, ঠোঁটের উপর ধবলের আভাস।

একদিন লক্ষ্য করলুম, লোকটা উপর্যুপরি আপিসে লেট করে আসছে। জবাবদিহি তলব করলুম। সে হাত কচলাতে কচলাতে বললে, "বড় বিপদে পড়েছি সার। নিজে রান্না করে খেয়ে ছেলেমেয়েগুলোকে খাইয়ে স্কুলে পাঠিয়ে তবে আসি। আমার পরিবারটি অসুখে পড়েছে—"

"কি হয়েছে—"

"বলে তো জ্বর হয়। আমি ঠিক বুঝতে পারি না। বলে বুকে ব্যথা, পিঠে ব্যথা, মাথায় ব্যথা। ওই নিয়েই কাজ করছিল এতদিন, ক'দিন থেকে শয্যা নিয়েছে। আমাকেই রাঁধতে হচ্ছে। একটা রাঁধুনীর চেষ্টায় আছি—আর লেট হবে না—"

"ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন কিছু?"

"হরেন সাণ্ডেলকে খবর দিয়েছি। তিনি আসবেন বলেছেন—"

"এ ব্যক্তিটি কে ?"

"হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার একজন। খুব হাতযশ—"

তারপর আরও বার দুই হাত কচলে বললে, "আপনাকে বলতে তো ভরসা পাই না। গরীব মানুষ আমি—"

"আচ্ছা, আমি যাব আপনার স্ত্রীকে দেখতে।"

গেলাম। গিয়ে দেখলাম, মানুষ নয়, একটি কঙ্কাল শতছিন্ন একখানা গোলাপী র‍্যাপার গায়ে দিয়ে বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে আছে। মুখের মধ্যে আছে শুধু ভাসা-ভাসা চোখ দুটি, আর সে চোখে কি উৎসুক করুণ দৃষ্টি। বুঝতে দেরি হল না যে কাল-রোগে ধরেছে—যক্ষ্মা।

বললাম, "ওষুধের চেয়ে এর খাওয়ার দরকার বেশি। ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করে রেখেছেন কেন, খুলে দিন। ভালো খাওয়া আর ভালো হাওয়া এই চাই এখন। জানালা বন্ধ করছেন কেন—"

"মথুর কবরেজ বললেন, কফের অসুখ কিনা, হাওয়া লাগলে বেড়ে যাবে—"

"খুলে দিন"

লোকটার মুখ দেখে মনে হল খোলবার ওর ইচ্ছা নেই, কিন্তু আমি ওর মনিব, ত্রস্ত হয়ে খুলতে লাগল। ছিট্‌কিনি টানার কর্কশ আওয়াজ থেকে অনুমান করলাম, এ জানালা জন্মে কখনও খোলা হয় না।

"কি খাচ্ছে ও—"

"জল বার্লি"

"দুধ টুধ দেন না ?"

"আজ্ঞে না। দুধে শুনেছি কফটা বাড়ে—"

ধমকে উঠলুম।

"আপনি তো মহাপণ্ডিত লোক দেখছি! দুধ দেবেন ওকে রোজ সেরখানেক করে। ডিমও দেবেন—"

"হাঁসের ডিম বলছেন? কিন্তু ওর বাঁ হাঁটুটাতে বাতের ব্যথা আছে।"

"বেশ, মুরগীর ডিম দিন তাহলে। একটা করে শুরু করুন প্রথমে—"

মুরগীর ডিম তো চলবে না সার। গোঁড়া ব্রাহ্মণের বংশ আমাদের—"

"ও। তাহলে ফলটল দিন। কলা, পেঁপে—"

তারপর হঠাৎ আমার মনে পড়ল, ফরমাস তো করে চলেছি লম্বা লম্বা কিন্তু লোকটার মাইনে যে মাত্র পঁচাত্তর টাকা।

"দুধ কতটা করে নেন আপনারা—ওকে দুধই একটু বেশি দিতে হবে।"

মুখ কাচুমাচু করে' অপূর্বচন্দ্র বললেন, "দুধ নিতে পারি না সার। যা দাম—"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এর চিকিৎসা তাহলে কি করে' হবে! জল বার্লি খাইয়ে যক্ষ্মারুগী বাঁচানো যায় না। রোক চড়ে গেল, বাঁচাতেই হবে ওকে।

বললুম—"হাসপাতালে যে লোকটা দুধ দেয় তাকে বলবেন, আপনার বাড়িতে যেন রোজ একসের করে দুধ দিয়ে যায়। আর দুধের বিলটা যেন আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। আর এর ওষুধপত্র যা লাগবে তা হাসপাতাল থেকেই পাবেন, আমি বলে দেব ডাক্তার ঘোষকে—"

"যে আজ্ঞে।"

হাসপাতাল থেকে দামী ওষুধ সাধারণ রোগীদের দেওয়ার নিয়ম ছিল না। তবে স্পেশ্যাল কেস হলে দেওয়া যেতো।

ওর নামটা হাসপাতালের খাতায় লিখে সেই বন্দোবস্তই করে' দিলাম।

অপূর্বচন্দ্র এসে খবর দিতে লাগল রুগী বেশ ভালোই আছে। পরে বুঝেছিলাম মিথ্যে খবর দিয়েছে।

মাসখানেক পরে একদিন ওদের বাড়ির কাছেই আর একটা রুগী দেখতে গিয়েছিলুম। মনে হল অপূর্বচন্দ্রের স্ত্রী কেমন আছেন একবার দেখে যাই। গিয়ে দেখলুম, যাকে পই-পই করে বিছানায় শুয়ে থাকতে বলেছিলুম, সে বারান্দায় বসে একটা তোলা উনুনে ক্ষীর করছে। পাশে একটা বাসনে খানিকটা ছানাও কাটানো রয়েছে।

আমি যে এমনভাবে সে সময়ে গিয়ে পড়তে পারি এ কথা ভাবতেই পারে নি সে। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে উঠে দাঁড়াল।

"কি খবর, কেমন আছ। এ কি, ছানা, ক্ষীর কার জন্যে? শুধু দুধ খেতে ভালো লাগছে না বুঝি—"

মেয়েটি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

"ক্ষীর হজম হবে তোমার? ছানাটা অবশ্য চলতে পারে—"

আমি তখন কল্পনাও করতে পারিনি যে ও ক্ষীর করছে ওর আফিং-খোর স্বামিটীর জন্যে, আর ছানা কাটিয়ে রেখেছে ওর ছেলেমেয়েদের সন্দেশ করে দেবে বলে। নিজে একফোঁটা দুধ একদিনও খায়নি।

জেরা করতেই সব বেরিয়ে পড়ল।

বলল, "উনি বুড়োমানুষ সমস্ত দিন খেটেখুটে আসেন, সন্ধেবেলা আফিং খান, একটু ক্ষীর হলে ওঁর শরীরটা ভালো থাকে। আর ছেলেমেয়েগুলো ইস্কুল থেকে এসে রোজই মুড়ি চিবোয়, সন্দেশের উপর ওদের কি যে লোভ, ময়রাটার খোঞ্চা থেকে

একদিন ফটিক সন্দেশ চুরি করে কি মারটাই যে খেয়েছিল, তাই ওদের জন্যে দু'চারটে সন্দেশ করে' রাখি—"

তখন জানতুম না যে ছেলেমেয়েগুলো ওর একটাও নয়, সব সতীনের।

বললাম, "কিন্তু তুমি রুগী, দুধ তো তোমারই খাওয়া আগে দরকার। তোমার জন্যেই দুধ হাসপাতাল থেকে ব্যবস্থা করে' দিয়েছি। আর তুমি ক্ষীর ছানা করে' ওদের খাওয়াচ্ছ।"

মেয়েটা ঘাড় ফিরিয়ে ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে রইল।

"হাত দেখি তোমার—"

কঙ্কালসার হাতটা বার করে দিলে। রক্তহীন শির-বার-করা হাত। পাল্‌স্ রেট একশ কুড়ি।

"না, এরকম উপোস করে থাকলে তোমার চিকিৎসা করতে পারব না। হাসপাতাল থেকে দুধ যদি আর একসের করে বাড়িয়ে দিই তাহলে তুমি খাবে?"

ঘাড় নেড়ে জানাল খাবে।

ফিরে গিয়ে আপিসে তার স্বামীকে ডেকে যাচ্ছেতাই বকলুম।

"আপনার অসুস্থ স্ত্রীর জন্যে হাসপাতাল থেকে দুধের ব্যবস্থা করে দিয়েছি, আর আপনি তাই মেরে ক্ষীর করে' খাচ্ছেন, লজ্জা করে না আপনার?"

হাত কচলাতে কচলাতে অপূর্বচন্দ্র বললে,—

"খুবই করে সার। কিন্তু কি করব, ও যে কিছুতেই খাবে না। বলে দুধ খেলে ওর পেট ভুটভাট্ করে। দুধ ওর সহ্য হয় না।"

"যাতে হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে।"

"তাহলে ওকে হাসপাতালে এনেই রাখুন সার। আমি একটা রাঁধুনীর সন্ধান পেয়েছি।"

হাসপাতালে একটা কেবিন খালি ছিল। পয়সা দিতে হবে

বলে' সেখানে সাধারণতঃ কোন রুগী জুটত না। মফস্বলের হাসপাতালে সকলেরই ইচ্ছে সম্পূর্ণ চিকিৎসাটা বিনা পয়সায় হোক। সেই কেবিনে এনে ভরতি করলুম সরমাকে। মেয়েটির নাম ছিল সরমা। হাসপাতালে এনে দেখলুম দুধ ওর বেশ হজম হয়। প্রায় সের দেড়েক দুধ অনায়াসে হজম করতে লাগল। দিন সাতেক পরে মেয়েটি একদিন সকাতরে আমাকে বললে—"দুধ আমার মুখে রুচছে না ডাক্তারবাবু। ওরা সবাই বাড়িতে শাকচচ্চড়ি আর ফ্যান-মেশানো কলাইয়ের ডাল খেয়ে দিন কাটাচ্ছে, আর আমি একলা ভালো ভালো খাবার খাচ্ছি—এ আমার একটুও ভালো লাগছে না। আমি যদি মরেই যাই তাতেই বা ক্ষতি কি। আমার চেয়ে ওঁর বাঁচাটা বেশি দরকার। অতগুলো ছেলেমেয়ের বাবা উনি। সমস্তদিন কলম পিষে ক্লান্ত হয়ে পড়েন—উনি একটু দুধ খেতে পান না—আর আপনি আমাকে দুধ খাওয়াচ্ছেন।"

আমি বললুম, "তোমার পতি-ভক্তির প্রশংসা করছি। কিন্তু তুমি রুগী, আমি ডাক্তার। তোমার রোগ যাতে সারবে আমাকে সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। তোমার স্বামী বা ছেলেমেয়েরা কি খাচ্ছে, তা নিয়ে মাথা ঘামালে তো চলবে না। তুমি আগে সেরে ওঠ, তারপর ওসব ভাবা যাবে। অপূর্ববাবু এতদিন যা খেয়ে কাটিয়েছেন, বাকী জীবনটাও তাই খেয়ে বেশ কাটিয়ে দিতে পারবেন। ও নিয়ে চিন্তা কোরো না। তোমার যা ব্যবস্থা করেছি সেই মত চলতে হবে তোমাকে—"

এর দিন কয়েক পরে শুনতে পেলুম কেবিনের সামনে হাল্লা উঠেছে একটা। সুহাসিনী নামে ঘোড়ামুখী একটা নার্স ছিল, সে খুব চেঁচামেচি করছে। গেলুম এগিয়ে।

"কি হয়েছে—"

"সরমাকে রোজ যা খেতে দি, তার আদ্ধেকের উপর ও সরিয়ে রেখে দেয়। রুটি, মাখন, ছানা, সব। আর আমরা যখন দুপুরে খেতে চলে যাই, ওই ছেলেটা এসে নিয়ে যায় রোজ—"

দেখলাম, আট-দশ বছরের ফটিক দাঁড়িয়ে আছে একটা ঝোলা হাতে করে। বমাল সুদ্ধ ধরা পড়েছে। কি আর বলব, ছেড়ে দিলাম। সুহাসিনী গজগজ করতে করতে চলে গেল।

সরমাকে বললাম—"তোমার উদ্দেশ্যটা কি বলতো? এরকম করলে তো তোমাকে হাসপাতালে রাখা যাবে না—"

সরমা ঘাড় হেঁট করে বসে রইল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, "সেই ভালো, আমি বাড়িই চলে যাই। ওসব একলা আমি খেতে পারব না।"

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম মিনিটখানেক। তারপর বললাম, "আচ্ছা, সুহাসিনীকে বলে দিচ্ছি তোমাকে বেশি বেশি করে দেবে। তুমি পেট ভরে খেয়ে বাকীটা বাড়িতে পাঠিয়ে দিও—"

এরকম সাধারণতঃ হয় না, এরকম করা নিয়মও নয়, কিন্তু আমার রোক চড়ে গিয়েছিল।

দিন পনেরো পরে আর একটা ঘটনা ঘটল। একদিন শুনলাম, ফিটফাট একটি সুদর্শন যুবক ফল-টল নিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

সুহাসিনী বলল—"সরমা কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা করলে না। ফল-টল ছুঁলেও না। অদ্ভুত মেয়ে বাবা।"

আমি রাউণ্ড দেবার সময় যখন ওর কেবিনে গেলাম, তখন দেখি বসে বসে কাঁদছে।

"কি হল, কে এসেছিল আজ তোমার সঙ্গে দেখা করতে—"

ঘাড় হেঁট করে বসে রইল খানিকক্ষণ, তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, "কেউ না—"

"অচেনা লোক কখনও ফল-টল নিয়ে দেখা করতে আসে? ভালো ভালো ফল এনেছিল শুনলাম, ফলগুলো ফেরত দিলে কেন?"

উত্তর দিলে না, চুপ করে বসে রইল।

আমার এ্যাসিস্টেণ্ট সার্জন ডাক্তার ঘোষ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়তে ভালোবাসতেন। তাঁর স্বভাবের মধ্যেও একটু ডিটেক্‌টিভ-ভাব ছিল। তিনিই একদিন ব্যাপারটার রহস্যোদ্ভেদ করলেন। বললেন, "ওই ছেলেটি খুব বড়লোকের ছেলে। সরমার বাপের বাড়ির লোক। সরমাকে খুব ভালো লেগেছিল, বিয়েও করতে চেয়েছিল কিন্তু বিয়ে হয়নি।"

"কেন, জাতে আটকালো?"

"না। পাল্‌টা ঘরই ছিল। আটকালো কুষ্ঠিতে।"

"বল কি! এত খবর তুমি জোগাড় করলে কি করে?"

"ভদ্রলোক আজ আমার আপিসে এসেছিলেন। হাসপাতাল ফাণ্ডে দুশো টাকা দান করে গেছেন, আর আমাকে অনুরোধ করে গেছেন, সরমার চিকিৎসার কোন ক্রটি যেন না হয়। আমি বললুম, কোন ক্রটি হচ্ছে না। ওর জন্যে আপনাকে টাকা দিতে হবে না। তিনি বললেন, না, আমি টাকা দিচ্ছি নিজের তৃপ্তির জন্যে। তারপর গল্প করতে করতে সব কথা বেরিয়ে পড়ল।"

সরমার চিকিৎসার কোন ক্রটি হয় নি। তবু তাকে বাঁচাতে পারিনি। পরে প্রকাশ পেল সে অন্তঃসত্ত্বা। মাস পাঁচ-ছয় পরে একটা মরা ছেলে প্রসব করে সে-ও মারা গেল। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত সে খোঁজ নিয়েছে তার স্বামী আর সতীনের ছেলে-মেয়েরা তার খাবারের ভাগ পাচ্ছে কি না।

সেই বড়লোকের ছেলেটি মাঝে মাঝে এসে সরমার খোঁজ নিতেন, কিন্তু সরমার ঘরে ঢুকতে সাহস পেতেন না।

সরমার সেই ভাসাভাসা চোখ দুটো আর কঙ্কালসার চেহারাটা এখনও মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে আমার মনে। রাত্রে একদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম তাকে। আমাকে যেন বলছে, "আচ্ছা ডাক্তারবাবু, শুনেছি জন্মমৃত্যু বিবাহ যখন যেখানে হবার তাই হয়। জন্মাবার সময় আমরা কুষ্ঠি দেখে জন্মাই না, মরবার সময়ও আমরা কুষ্ঠি দেখে মরি না, বিয়ের বেলাতেই কুষ্ঠির এত বাড়াবাড়ি করি কেন বলুন তো—"

স্বপ্নের সরমা একথা বলেছিল, কিন্তু বাস্তবের সরমা বোধহয় একথা ভাবতেও পারত না। তবু ওই অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জেদী মেয়েটা আজও আমার কাছে প্রণম্য হয়ে আছে।

চতুর্থ যে কন্যাটির কথা মনে পড়ছে, তার কথা বলব কি না ভাবছি। কারণ তোমরা বাল্যকাল থেকে মনে মনে যে ছক এঁকে রেখেছ, তার সঙ্গে এটা মিলবে না। কারণ মেয়েটি মুসলমানী, তার উপরে বাঈজি। হিন্দুদের ধারণা যা কিছু হিন্দু তাই ভালো, মুসলমানদের ধারণা যা কিছু মুসলিম্ তাই ভালো। এমনি করে তোমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা খোপ-খোপ করে' ভাগ করে ফেলেছ তোমরা। আমার নিজেরও যে এই ধরণের কুসংস্কার নেই তা নয়। ডাক্তারি করতে করতে, আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ দোষ খানিকটা কমেছে অবশ্য, এটা বুঝতে পেরেছি যে, শিশির গায়ের লেবেল দেখেই সব সময় ওষুধের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না, যাচাই করে দেখতে হয়। এই সূত্রে একটা গল্প মনে পড়ল। সমর দে নামে আমার এক বন্ধু ছিল। তার বাড়িতে একদিন সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে গেছি। ছুরি

দিয়ে নখ কাটতে কাটতে হঠাৎ একটা আঙুলে রক্তারক্তি হয়ে গেল। সামনেই একটা সেলফ্ ছিল। তাতে দেখলাম টিঞ্চার আইয়োডিন লেবেল দেওয়া একটা শিশি রয়েছে। উঠে গিয়ে সেটা নিয়ে ছিপি খুলতে যাচ্ছি, সমর বললে,—ওটা নিও না। ওতে আইয়োডিন নেই। তার পাশেই আর একটা শিশি রয়েছে দেখলাম—গায়ে লেবেল ডেটল্। বললাম—তাহলে এইটে নি। একটু জল আনাও। সমর বললে—ওটা ডেটল্ নয়। পাশে আর একটা শিশির গায়ে লেখা দেখলাম টিনচার বেনজোইন। সমর বললে—ওটাও বেনজোইন নয়। অবাক হয়ে গেলাম। শেলফে আরও নানারকম শিশি ছিল সারি সারি কোনটাতে লেবেল—সিরাপ হিমোগ্লোবিন, কোনটায় জোয়ানের আরক, কোনটা চিরেতার জল। সমর বললে—'লেবেলে যা লেখা দেখছ, তা একটা শিশিতেও নেই।' জিগ্যেস করলুম, 'এতগুলো খালি শিশি রেখেছ কেন?' সমর বললে, 'একটিও খালি নয়, প্রত্যেকটিতে ব্র্যাণ্ডি আছে। বাবা মা সর্বদাই এ ঘরে ঢোকেন কি না, প্রকাশ্যে কি করে রাখি বল। তা ছাড়া চণ্ডেটাও আসে প্রায়। ও যদি ব্র্যাণ্ডির বোতলের সন্ধান পায় তাহলে কি আর রক্ষে আছে! তাই এই ফন্দী করেছি।'

সুতরাং লেবেল সব সময় বিশ্বাসযোগ্য নয়। মুসলমান বাঈজি শুনে আমারও নাকটা কুঁচকে গিয়েছিল প্রথমে। সে বহুদূর থেকে আমার কাছে চিকিৎসার জন্যে এসেছে, অনেক টাকা ফি দিয়ে অ্যাপেনডিক্স অপারেশন করাবে—এসব জানা সত্ত্বেও নাকটা কুঁচকেই ছিল। গঙ্গার ধারে শ্মশানের কাছাকাছি প্রকাণ্ড একটা কম্পাউণ্ড-ওলা বাড়ি ছিল, সেইটে ভাড়া নিয়েছিল সে। বেশ জমজমাট ব্যাপার। আট দশটা চাকর, আট দশটা চাকরাণী, আয়া বাবুর্চি মোটরকার শফার।

প্রথম যেদিন তাকে দেখতে গেলুম সেদিন নজরে পড়ল একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে বসে আছে তার বিছানায়। বয়স বছর দশেক আন্দাজ হবে। আমি ঘরে ঢুকতেই বাঈজি ছেলেটিকে বললে, "ডাক্তার সাহেবকে প্রণাম কর—"

ছেলেটি এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। প্রত্যাশা করেছিলুম, মুসলমান যখন, আদাব করবে। তারপর মনে হল বাঈজিদের কোন জাত থাকে না বোধহয়, হিন্দুকে হিন্দুর মতো অভ্যর্থনা করে, মুসলমানকে মুসলমানের মতো। কিন্তু আমার এ থিয়োরি খাটল না, আমি যখন উঠে আসছি তখন সে নিজে আমাকে মুসলমানী কয়াদাতেই আদাব করল।

রোজই দেখতে যেতুম তাকে দুবেলা। অপারেশন করবার তেমন তাড়া-হুড়ো ছিল না। পেটে ছুরি বসাবার আগে দেখছিলুম, এমনি চিকিৎসা করে ব্যথাটা যদি কমে যায়, তাহলে পরে ধীরে সুস্থে অপারেশন করে দেব।

একদিন আমার যেতে একটু রাত হয়েছে, দেখি সে গঙ্গার দিকের প্রশস্ত ছাতে বসে সেতারে কি একটা সুর আলাপ করছে। মনে হল কানাড়া। আমাকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হল। কারণ আমি তাকে শুয়ে থাকতে বলেছিলাম।

"আজ অনেক ভালো আছি। ব্যথা একেবারে নেই। তাই সেতারটা নিয়ে বসেছি। আপনার জন্যে চা আনতে বলি?"

সাধারণতঃ রুগীর বাড়িতে আমি খাই না, কিন্তু সেদিন আর আপত্তি করলাম না, অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম।

চা-পর্ব শেষ হয়ে যাবার পর সে আমাকে বললে, "ডাক্তারবাবু, এতদিন তো আপনাকে কেবল রোগের কথাই বলেছি, আজ একটা অন্য কথা বলতে চাই। যদি আপনি এ বিষয়েও আমাকে একটু

সাহায্য করেন, তাহলে বড়ই উপকার হয় আমার। শুনবেন কথাটা? এই সময়েই বলা ভালো, কারণ ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে—"

"কি বলুন—"

"আমি ছেলেটার পৈতে দিতে চাই। এখানে কি সে ব্যবস্থা করে' দিতে পারেন?"

"পৈতে? আমার ধারণা ছিল আপনি মুসলমান।"

"আমি মুসলমান। কিন্তু ছেলেটি ব্রাহ্মণের ছেলে। শুধু ব্রাহ্মণ নয়—খুব উঁচুদরের ব্রাহ্মণের ছেলে—"

আমার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম শুধু। দৃষ্টির প্রশ্ন যখন রসনায় বাঙ্ময় হল, তখন সেটা ঠিক ভব্যতাসূচক হল না। কোন লেডির কাছে এরকম প্রশ্ন করা কায়দা-দস্তুর নয়।

মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, "বাপের খবর পেলুম। কিন্তু মা-টি কে?"

"আমিই ওর মা।"

"তাহলে ও ছেলে কি আর ব্রাহ্মণ আছে?"

"জবালার গর্ভজাত পুত্রকে ঋষি গৌতম তো অব্রাহ্মণ বলেন নি।"

তারপর একটু হেসে বললে—"আমি মুসলমান, কিন্তু আমি রামায়ণ মহাভারত পুরাণ কিছু কিছু পড়েছি। পড়েছি বলেই জানি হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণ বলতে কি বোঝায়। ওর বাবা খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন, আমার ইচ্ছে ছেলেও খাঁটি ব্রাহ্মণ হোক। তাই প্রথমে ওর পৈতেটা দিতে চাই। আমি যেখানে থাকি সেখানে দেওয়া সম্ভব হয় নি, কারণ কোনও ভালো ব্রাহ্মণই আমার বাড়িতে এসে পৌরোহিত্য করতে রাজি হন নি। আমার এখানে আসার এ-ও একটা কারণ। ওর পৈতের একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?

ভালো ব্রাহ্মণ পুরোহিত চাই একটি। যজন-যাজন করেন এরকম ব্রাহ্মণ পাওয়া যাবে তো? সে রকম পেলেই যথেষ্ট। একটিমাত্র আদর্শ ব্রাহ্মণই দেখেছিলাম জীবনে—"

"কে তিনি—"

"ওই ছেলের বাবা।"

আমার মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে পড়েছিল—'ব্রাহ্মণটি তোমার খপ্পরে পড়লেন কি করে,'—কিন্তু সামলে নিলুম।

ভদ্রভাষায় বললুম—"আপনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় কি করে হয়েছিল? বলতে যদি অবশ্য বাধা থাকে, শুনতে চাই না—"

মেয়েটি একটু চুপ করে থেকে বলল—"বলতে আর বাধা কি। তবে একটা ভয় শুধু হয়, পাছে তাঁকে ভুল বোঝেন। সেইজন্যে গোড়াতেই বলছি দোষটা সম্পূর্ণ আমার।"

তারপর একটু হেসে বললে—"রামায়ণ মহাভারত তো পড়েছেন, স্বর্গের অপ্সরারা এসে বড় বড় মুনি ঋষিদের তপোভঙ্গ করত। আমার কৃতিত্ব শুধু এইটুকু যে, আমি মর্ত্যের সামান্য মানবী হয়েও তাঁর মতো লোককে ভুলিয়ে রাখতে পেরেছিলাম কিছুদিনের জন্য—"

আমি হেসে বললুম,—"আমার তো মনে হয় পোড়-খাওয়া সংসারী লোকদেরই ভোলানো শক্ত। মুনি-ঋষি-জাতীয় লোকরা এত বেশি সরল আর এত বেশি ভাব-প্রবণ যে একটুতেই তাঁরা গলে' যান।"

মেয়েটি বলল—"ঠিক বলেছেন, ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির সঙ্গেই ওঁর উপমা দেওয়া চলে। আমি ওঁকে অবশ্য সন্দেশ দিয়ে ভোলাই নি, রূপ দিয়েই ভুলিয়েছিলাম। রূপ দেখে মুগ্ধ হওয়াটা পাপ নয় নিশ্চয়, কারণ দেবতার কাছে আপনারা যে প্রার্থনা করেন তার প্রথমেই আছে রূপং দেহি—"

মেয়েটির কথাবার্তা শুনে ক্রমশই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল না যে আমি একজন মুসলমানী বাঈজির সঙ্গে আলাপ করছি। বরং মনে হচ্ছিল, যেন একজন শিক্ষিত বিদগ্ধ অধ্যাপকের কাছে বসে আছি। কথা কইতে কইতে একবার মনে হয়েছিল গ্রীস দেশের গল্পে যে স্যাফোর কথা পড়েছি সে কি এই রকম ছিল? মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলুম।

হঠাৎ কানে গেল মেয়েটি বলছে—"রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন বলে উনিও ক্ষুব্ধ হন নি। রূপের মন্দিরে উনি সরল বিশ্বাসে দেবতাকেই সন্ধান করছিলেন, কিন্তু উনি যখন জানতে পারলেন আমি ওঁকে প্রতারণা করেছি, তখনই ফুরিয়ে গেল সব। সেই মুহূর্তে উনি আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন।"

"প্রতারণার ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না ঠিক—"

"ওঁকে দেখে আমিই প্রথমে মুগ্ধ হয়েছিলাম। দশাশ্বমেধ ঘাটে একগলা জলে দাঁড়িয়ে উনি সূর্য-অর্ঘ দিচ্ছিলেন। সেই প্রথম ওঁকে দেখি। তারপর ওঁকে দেখবার জন্যে রোজই গিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম। উনি চেয়ে থাকতেন সূর্যের দিকে আর আমি চেয়ে থাকতাম ওঁর দিকে। প্রায় দশ পনর দিন আমি ওঁর চোখেই পড়িনি। উনি যখন স্নান করে উঠে যেতেন, আমি ওঁর পিছু পিছু যেতাম। তারপর একদিন হঠাৎ উনি আমাকে দেখতে পেলেন। তখন আমার কিছু রূপ ছিল। ক্রমশঃ এটাও উনি লক্ষ্য করলেন যে, আমি রোজ ঘাটে আসি, রোজ ওঁর পিছু পিছু যাই। একদিন উনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কে, কেন ওঁর পিছু পিছু আসি। তখন আমি ওঁকে বলতে পারলাম না আমার সত্য পরিচয় কি। বানিয়ে মিথ্যে একটা গল্প বললাম। বললাম আমি অনাথিনী, গরীব ব্রাহ্মণের কুমারী মেয়ে। বিয়ে দেবার জন্যে বাবা-মা আমাকে নিয়ে এখানে

এসেছিলেন, কিন্তু তাঁরা দুজনেই হঠাৎ মারা গেছেন! আমি এখন এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে আছি। আমার লেখাপড়া শেখবারও খুব ইচ্ছে। একজন আমাকে বলেছিল, আপনি যদি দয়া করেন, তাহলে আমার লেখাপড়া শেখবার ব্যবস্থা সহজেই হতে পারে। সংস্কৃত শেখবার খুব ইচ্ছে আমার। তিনি একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "আচ্ছা, এস আমার সঙ্গে—।" গেলাম তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। বুঝতে দেরি হল না যে, আমাকে তাঁর ভালো লেগেছে। একথা বুঝতে দেরি হয় না মেয়েদের, বিশেষত আমাদের মতো মেয়েদের, যারা রূপ নিয়ে ব্যবসা করে। তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখলাম, তিনি একটি গলিতে ছোট্ট একটি বাড়ি নিয়ে একাই থাকেন। আমাকে বললেন, এই আমার বাড়ি, তোমার দূর সম্পর্কের যে আত্মীয় আছেন বলছ, তাঁকে নিয়ে এখানে এস, তাঁর সঙ্গে কথা কইব। এক নকল পিসেমশাই খাড়া করা অসম্ভব হল না। কিছু অর্থের বিনিময়ে তিনি বানিয়ে যা বললেন, তা শুনে আমিই অবাক হয়ে গেলাম। ওঁর বাড়িতে আমি আশ্রয় পেলাম এবং ক্রমশঃ বাড়ির কর্ত্রীই হয়ে উঠলাম। পুরুষরা, বিশেষত প্রতিভাবান পুরুষরা, শিশুর মতো অসহায়। সেবা করে' মা যেমন শিশুর হৃদয় অধিকার করে, সেবা করে' তেমনি বয়স্ক লোকের হৃদয়ও অধিকার করা খুব সহজ। বস্তুত, ও-ই বোধহয় হৃদয় জয় করবার একমাত্র উপায়। কিছুদিন পরে তিনি আমাকে বললেন, "তুমি খুব মেধাবিনী, তোমাকে আমি পড়াব। কিন্তু তার আগে তোমাকে আমি ধর্ম-পত্নী-রূপে গ্রহণ করতে চাই। তা না হ'লে নানা রকম বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। তোমার পিসেমশাইকে বোলো, তিনি যেন এসে তোমাকে আমার হাতে সম্প্রদান করেন শাস্ত্রবিধি অনুসারে। তোমার আপত্তি নেই তো?" আমার আপত্তি! আমি হাতে স্বর্গ পেলাম। নকল

পিসেমশাই আরও কিছু টাকা খেয়ে নকল বিয়ের সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। ওঁর পক্ষের পুরোহিত উনি নিজেই হলেন। বিয়ে হয়ে গেল। সংস্কৃত পড়তে শুরু করলাম ওঁর কাছে। মাস ছয়েক কাটল। তারপর একদিন সত্যটা প্রকাশ হয়ে পড়ল ওঁর কাছে। আমারই এক পুরাতন প্রণয়ী কথাটা ফাঁস করে দিল এসে। লোকটি অনেকদিন থেকেই আমাকে চাইছিল, কিন্তু আমি রাজী হই নি। তারপর আমি যখন ওঁর গৃহিণী হয়ে পড়লাম, তখন আর রাস্তায় বেরুতাম না। খোঁজ নিয়ে অবশেষে সে একদিন হাজির হলো এসে। কথাটা শুনে উনি আমাকে জিগ্যেস করলেন, কথাটা সত্যি কি না। আমি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর সত্যি কথাটাই বললাম। তাঁর এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আর মিথ্যে কথা বলতে পারলাম না। আমার কথা শুনে তিনি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বেরিয়ে চলে গেলেন। আর ফিরলেন না। আর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। তার পরদিন আমিও কাশী ছেড়ে চলে গেলাম। অনেক জায়গায় খুঁজেছি তাঁকে। কিন্তু আর তাঁর নাগাল পাই নি। শুনেছিলাম পুষ্করতীর্থে গিয়ে তিনি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। পুষ্করেও গিয়েছিলাম আমি, কিন্তু আমি যখন গেলাম, তখন তিনি চলে গেছেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথাটা নাকি সত্যি। খোঁজ নিতে ওরা বললে—"একটি সাধু নিজের চারিদিকে আগুন জ্বেলে অনাহারে কি একটা কঠোর ব্রত করেছিলেন। সাধুর চেহারার বর্ণনা থেকে মনে হল, উনিই সেই সাধু—"

মেয়েটি একটু চুপ করে থেকে বলল, "এখন ওঁর ছেলেকে ওঁর মতো করে মানুষ করাই আমার জীবনের ব্রত হয়েছে—"

"ছেলে কিছু জানে না?"

"না। সে জানে আমি তার মায়ের বন্ধু। মা-বাবা দুজনেই

প্লেগে মারা গেছে, আত্মীয়স্বজনও কেউ নেই, আমি ওকে মানুষ করছি। এও জানে যে ও ব্রাহ্মণের ছেলে, আর আমি মুসলমান।"

"আপনার সঙ্গে থাকতে আপত্তি করে নি কখনও ?"

"ও তো আমার সঙ্গে থাকে না। ও কাশীতে থাকে আলাদা বাসায়। ওর জন্যে হিন্দু চাকর-চাকরাণী, রাঁধুনী সব রেখে দিয়েছি আমি। আমার নিজের দুধও খাওয়াইনি ওকে। ব্রাহ্মণের মেয়ে ওয়েট নার্স ওকে মানুষ করেছে। ওকে আমি আমার ছোঁয়াচ থেকে যতদূর সম্ভব বাঁচাবার চেষ্টা করেছি। এখন ওর ছুটি, আর আমার অসুখের খবর পেয়েছে, তাই এসেছে। ওর চাকর-রাঁধুনীও সব সঙ্গে এসেছে। এই যে এতগুলো চাকর দেখছেন, এর অর্ধেক ওর বাসার। আমি ওকে একদিনও খাওয়াই নি, খাওয়াতে সাহস হয় নি—"

হঠাৎ তার গলার স্বরটা একটু কেঁপে গেল। আমি চুপ করেই ছিলুম, প্রশ্ন করে' গল্পের রসভঙ্গ করি নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা কথা জিজ্ঞাসা না করে' পারলুম না।

"আপনার এত খরচ চলে কি করে' ? আপনি কি—"

"আমার জাত ব্যবসা আমি বন্ধ করিনি। তিন চারটে বড় বড় স্টেটের বাঁধা গাইয়ে আমি। বাঁধা মাইনে আছে। তাছাড়া উপরি রোজগারও হয়। আপনাদের লাইনে যেমন, আমাদের লাইনেও তেমনি, একবার নাম হয়ে গেলে টাকার অভাব হয় না।"

"কিন্তু—"

আমাকে কথা শেষ করতে দিলে না সে। বললে, আপনি যা জিগ্যেস করবেন তা বুঝতে পেরেছি। আপনার মনে হচ্ছে, যার জীবনে অত বড় একটা লোকের আবির্ভাব ঘটেছিল, সে আবার কি করে এই জঘন্য ব্যবসা করতে পারে। যদি নিষ্ঠাবতী বিধবার মতো থাকতুম, তাহলে ওঁর ছেলেকে ওঁর মতো করে' আমার ছোঁয়াচ

থেকে বাঁচিয়ে মানুষ করতে পারতুম না। এর জন্যে টাকা চাই। দ্বিতীয় কথা, মনের দিক থেকে আমার আর পতন হবার ভয় নেই। স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা সোনা হয়ে গেছে, তাতে আর মরচে লাগবে না।"

সেদিন রাত্রে দুজনেই আমরা অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। মাথার উপর অসংখ্য তারা জ্বলছিল, রাত্রির অন্ধকার মুখরিত হয়ে উঠছিল ঝিল্লী রবে। মনে হচ্ছিল, অব্যক্ত যেন ব্যক্তের সীমায় ধরা দেব-দেব করছে।

তার ছেলের পৈতের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলুম। মহাসমারোহ হয়েছিল। সীতারাম স্মৃতিতীর্থ, যিনি পাঁজি দেখে ট্রেনে চড়েন, হাঁচি টিকটিকি কাক-খঞ্জন দেখে দিনটা কেমন যাবে ঠিক করেন, বেরুবার মুখে রজক দেখলে থেমে যান, সেই ভদ্রলোক এক বাঈজির ছেলের উপনয়নে পৌরোহিত্য করতে ইতস্ততঃ করলেন না, যেই শুনলেন দক্ষিণার পরিমাণ হাজার টাকার কম হবে না। শহরসুদ্ধ লোক খেয়েছিল। ধনী দরিদ্র আপামর ভদ্র সবাই।

আমি তার অ্যাপেন্‌ডিক্‌সও কেটে দিয়েছিলাম। বেশ মোটা ফি দিয়েছিল। তারপর যাবার আগে সে আমাকে আরও পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক দিয়ে কি বললে জান?

"ছাত থেকে দাঁড়িয়ে রোজই দেখি, শ্মশানে মড়া নিয়ে যেতে বড় কষ্ট হয় সকলের। রাস্তাটা খুব খারাপ। বর্ষাকালে নাকি আরও খারাপ হয়ে যায়। ওটা পাকা করিয়ে দিন। যদি আরও টাকা লাগে জানালেই আমি পাঠিয়ে দেব।"

তার নাম ছিল বেগম রৌশন আরা। তার রূপের বর্ণনা আমি করি নি, করবও না। এইটুকু শুধু বলব, ওই মেয়েটি আমার ডাক্তারি জীবনের পরম অভিজ্ঞতা একটি। একথাও মাঝে মাঝে

মনে হয়েছে, ভাগ্যে ডাক্তার হয়েছিলুম, তাই তো ওর পরিচয় পেয়ে ধন্য হয়েছি।

আমার একটা কথা কি মনে হয় জান? মেয়েদের আমরা যুগে যুগে নানা রকম করে' দাবাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি, ওদের কাছে হেরে গেছি। আমাদের অত্যাচারের হিমালয় ঠেলে যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছে অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তীরা, দেখা দিয়েছে সরমা-রৌশন-আরারা, শুধু দেখা দেয়নি, তাক লাগিয়ে দিয়েছে। মুখে যাই বলি, মনে মনে স্বীকার করতে হয়েছে, ওই অবস্থায় পড়লে আমরা ঠিক ওরকমটি করতে পারতুম না। সেইজন্যেই শাস্ত্রে ওদের শক্তি বলে পূজো করেছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা ওদের এই বিশেষ শক্তিটাকে কাজে লাগাতে পারলুম না। হয় সারাজীবন রাঁধুনী-চাকরাণী করে রাখলুম সতীত্বের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে, না হয় পরীক্ষার পড়া মুখস্ত করিয়ে শ্রমিক করবার চেষ্টা করলুম সংসারের সুবিধে হবে বলে। আমাদের নিজেদের সংসারের কিসে সুবিধে হবে এই নিয়েই আমরা ব্যস্ত, ওদের বিশেষ শক্তিকে ফুটিয়ে তোলবার কোনও চেষ্টা আমাদের নেই, ওদের যে আর কোন শক্তি আছে এ দেখবার চোখও অনেকের নেই, বুদ্ধিও নেই। অর্থনৈতিক সমস্যা? হ্যাঁ জানি, ওইটেই তো তোমাদের বাঁধা বুলি। ওই সমস্যা মেটাবার জন্যে তোমরা বউকে রাঁধুনী করেছ, কেরানী করেছ, ওই সমস্যার সমাধান করবার জন্যে কাপড় ছেড়ে হাফপ্যাণ্ট পরেছ, মিছে কথা বলেছ, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহস করে প্রতিবাদ কর নি, এত করেও তবু তোমাদের আর্থিক সমস্যার আর সমাধান হল না। খাবার সময় সেই শাকচচ্চড়ি আর ভাত, আর যেখানে সেখানে এর-ওর-তার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নাকিকান্না, এ আর তোমাদের ঘুচল না। ঘুচবেও না। মানুষকে বাসন কাপড় চেয়ার টেবিলের মতো ব্যবহার করলে দুর্দশা বেড়েই চলে, কখনও কমে

না। কিন্তু ওই রৌশন-আরা-সরমারা তোমাদের নিয়মকানুনের মুখে লাথি মেরে নিজেদের পথে নিজেদেব মতো বেঁচে কিম্বা মরে' প্রমাণ করে দিয়েছে যে পৃথিবীতে আইনের চেয়ে মানুষ বড়। সেই বৃহত্তে পৌঁছবার জন্যে আইন ভাঙাটাই মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব।

আমার ভয় হচ্ছে, তুমি বোধ হয় এতক্ষণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছ। মধুর রসের আশায় সম্ভবত পঞ্চকন্যার গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছিলে (পর্ণোগ্রাফিই যে তোমাদের প্রিয় জিনিস, তা পপুলার কতকগুলো বই আর ফিল্‌ম থেকেই বোঝা যায়), কিন্তু যে বস্তু আমি তোমাকে গিলিয়ে যাচ্ছি, তা শুগার-কোটেড কুইনিনের বড়ি, মাঝে মাঝে চিনির পলেস্তারাটাও হয়তো উঠে গেছে কোথাও কোথাও।

কিন্তু এখন তো আমার পক্ষে থামা শক্ত। চারটে বড়িই যখন গিলেছ, তখন পঞ্চমটাও দুর্গা বলে গিলে ফেল। হয়তো আখেরে উপকারই হবে।

তখন আমি বিহারের একটা বড় শহরে আছি। কার পরামর্শে এখন ঠিক মনে নেই, একটা পুরোনো মোটরকার কিনে অশেষ দুর্গতি ভোগ করছি। মোটরটা মোটর না হয়ে যদি মানুষ হতো তাহলে ওর খামখোয়ালী ব্যবহারে হয়তো আনন্দ পেতাম। যখন খুশী থামতো, যখন খুশী চলতো। হর্ন যখন বাজবে না, তখন কিছুতেই বাজবে না, আবার বাজতে আরম্ভ করলে থামানো শক্ত। এই মোটরে চড়ে একদিন দুপুরবেলা এক পতিতা পল্লীর ভিতর দিয়ে আসছি, হঠাৎ মোটরটা থেমে গেল। দু'চার জন লোক ডেকে ঠেলাবার চেষ্টা করছি, এমন সময় হঠাৎ কানে গেল—"ওগো মা গো, কোথায় তুমি গো, আমায় বাঁচাও গো, এরা যে আমায় মেরে ফেলছে।" বিহারের এই পাড়ায় এরকম বাংলা কান্না শুনে একটু অবাক হয়ে

গেলুম। ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলুম—একটা ঘরের সামনে একটা ষণ্ডা কাবুলী আর একটা খাণ্ডারনী মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেয়েটা হিন্দী ভাষায় অশ্রাব্য গালাগালি দিচ্ছে, তর্জন গর্জন করছে আর শাসাচ্ছে যে, কপাট না খুললে কপাট ভেঙে তারা ঘরে ঢুকবে। কপাটটা ভিতর থেকে বন্ধ।

আমার মাঝে মাঝে মতিচ্ছন্ন হয়। ঠেলাঠেলি করে মোটরটা স্টার্ট নিয়েছিল, আমি সটান চলে গেলেই পারতুম, কিন্তু যেতে পারলুম না। ওই বন্ধ দরজার ওপারে বাংলা ভাষায় এমন বুকফাটা হাহাকার কে করছে, তা জানবার কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠল। একটা পুলিশ কনেস্টবল, একটু দূরে নির্বিকার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি তখন সেখানে সিভিল সার্জন। সুতরাং আমাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। তার দিকে চাইতেই সে পায়ে পা ঠুকে মিলিটারি কায়দায় সেলাম করলে। তাকে ডাকলাম। বললাম, 'দেখ তো এখানে হাল্লা কিসের, ঘরের ভিতর অমন করে' কাঁদছে কে।' আমি গিয়ে মোটরে বসলাম। মিনিট দশেক পরে সে এসে বললে—"ওই জবরদস্ত আওরৎটি হচ্ছে বাড়ি-উলী। আর ওই আগা সাহেব হচ্ছে ওর খদ্দের। বাড়ি-উলী আগা সাহেবের কাছ থেকে অগ্রিম একশ টাকা নিয়েছে। এক 'বাঙালীন্' খবসুরৎ লেড়কি বাড়ি-উলীর কাছে এসেছে দিনকয়েক আগে। আগা সাহেবের 'খাইশ' (ইচ্ছে) হয়েছে ওই মেয়েটিকে রাখেন। কিন্তু 'বাঙালীন্' লেড়কিটি কিছুতে রাজী হচ্ছে না। এখন হুজুর আমাকে যা করতে বলেন তাই করব।" বললাম, "তুমি ওই আগা সাহেবকে ভাগিয়ে দাও। বল যে তার টাকা মারা যাবে না, আমি তার জিম্মাদারি রইলাম। আর বাড়ি-উলীকে ডেকে নিয়ে এস আমার কাছে।"

আগা সাহেব চলে গেল। তার সুখ-স্বপ্নের মাঝখানে একটা

বুড়ো সিভিল-সার্জন ভাঙা ঝরঝড়ে মোটরে চড়ে' এসে হাজির হবে এটা সে ভাবতেই পারে নি। কিন্তু ওরা প্র্যাক্‌টিক্যাল লোক, খামখা বড়লোক বা 'অফ্‌সর'দের সঙ্গে ঝগড়া করতে চায় না। সে আমাকে একটা সেলাম করে চলে গেল এবং একটু দূরে গিয়ে আর একটা খোলার ঘরে ঢুকে পড়ল। বাড়ি-উলীটি কনেষ্টবলের সঙ্গে এসে যখন হাজির হল, তখন তার মুখের চেহারা ভাবভঙ্গী সব বদলে গেছে। একেবারে অন্য লোক যেন। চোখমুখের সে কী সম্ভ্রমাত্মক ভাব, পানের-ছোপ-লাগা ঠোঁটের ফাঁকে মিসি-মাখানো দাঁতে সে কি হাসির ঝলক। খদ্দের হিসেবে আগা সাহেবের চেয়ে যে আমি ঢের বেশী বাঞ্ছনীয়, একথা সে কিছু না বলেই যেন আমাকে বুঝিয়ে দিলে। বললে, "হুজুর, ফরমাইয়ে, অব্‌ ক্যা করুঁ" অর্থাৎ ফরমাস করুন এবার কি করব। বললাম—"ওই মেয়েটিকে কপাট খুলতে বল। বল, এখানকার বাঙালী ডাক্তার সাহেব তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, আগা সাহেব চলে গেছে।" বাড়ি-উলী গিয়ে কপাটের সামনে দাঁড়িয়ে একথা বলা সত্ত্বেও কপাট খুলল না খানিকক্ষণ। মেয়েটার সম্ভবত সন্দেহ হল যে, একটা মিথ্যে ছুতো করে বাড়ি-উলী কপাট খোলাচ্ছে, কপাট খুললেই ওই কাবুলীওলা ঢুকে পড়বে। তখন আমি নিজেই নামলুম। বদ্ধদ্বারে আঘাত করে চেঁচিয়ে বললুম, "কপাট খোল। তোমার কোন ভয় নেই। কাবুলীওলা চলে গেছে।"

ভাষার যাদু যে কি অদ্ভুত, ভাষা যে আমাদের কি নিবিড় বন্ধনে বেঁধে রাখে, তা বিদেশে গেলে বোঝা যায়। কারও মুখে বাংলা ভাষা শুনলেই মনে হয়, সে যেন আমার আপনার লোক। আমার কথা শুনে ওই মেয়েটিরও বোধহয় তাই মনে হল। বদ্ধ কপাট খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ঘরে ঢুকে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। এমনটা যে দেখব, তা কল্পনা করি নি। মনে হল অজন্তার ছবি

এমন জীবন্ত হয়ে কি করে' অবতীর্ণ হল এখানে! ঠিক সেই মুখ, সেই নাক, সেই চোখ, সেই চাহনি,—আমি ঘরে ঢুকতেই মেয়েটি আমার পা ছুটো ধরে' বললে, "আপনি আমার বাবা, আমাকে বাঁচান আপনি। এরা আমাকে মেরে ফেলছে। মাত্র সাত দিন এখানে এসেছি—চল্লিশ পঞ্চাশটা নানা জাতের, নানা বয়সের লোক এনে ঘরে ঢুকিয়েছে বাড়ি-উলী। আজ একটা কাবুলেকে এনেছে, আমাকে রক্ষা করুন আপনি, আমি আর পারছি না।"

আমার পা জড়িয়ে হাউ হাউ করে' কাঁদতে লাগল। বেশ একটু বেকায়দায় পড়ে গেলুম। ঘড়ি দেখলুম দেড়টা বেজেছে। মনে পড়ল, আমার সতীলক্ষ্মী স্ত্রী আমার অপেক্ষায় অনাহারে বসে আছেন এখনও, আর বেশি দেরি করলে অনর্থকাণ্ড হবার সম্ভাবনা। জঠরাগ্নির উত্তাপের সঙ্গে সতীত্বের তেজ মিলে যে অগ্নিকাণ্ড হবে, তা নেবাবার ক্ষমতা কোন দমকলেরই নেই। সুতরাং শর্ট-কাট্ ব্যবস্থা করলুম একটা। সেদিন অনেকগুলো 'কল' পেয়েছিলুম। পকেটে কিছু টাকা ছিল। মেয়েটিকে পঁচিশ টাকা আর বাড়ি-উলীকে পঁচিশ টাকা দিয়ে বল্লাম—"এখন তোমরা এই টাকা রাখ। আমি সন্ধ্যের পর আবার আসব। এসে সব শুনে একটা ব্যবস্থা করে' দেবো। কিন্তু এর ঘরে এখন আর কোনও লোক যেন না ঢোকে।"

সেই কনেষ্টবলকে ডেকে বললুম—"তুমি দেখো, এর উপর কেউ যেন বলাৎকার না করে। আমি এস-পি-কেও খবর পাঠাচ্ছি।"

তখন এস-পি ছিলেন একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্যক্তি। মনুষ্যরূপী বাঘ একটি। যাকে ছুঁতেন তাকে শুধু আঠারো ঘা নয় অনেক বেশি ঘা দিতেন। এস-পি'র নাম শুনে কনেষ্টবল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্ল। পায়ে পা ঠুকে আমাকে আর একবার সেলাম করে' বলল—"আমি ওর দরোওয়াজায় খাড়া পাহারা থাকব। এক তিতলিকো ভী ঘুসনে নেহি দেউঙ্গা।" তিত্লি মানে আমি তখন বুঝেছিলাম পিঁপড়ে,

কিন্তু পরে জেনেছি প্রজাপতি। সেদিন ওই ভোজপুরী কনেষ্টবল আর আফগানী আগা তুজনেই রস-বোধের পরিচয় দিয়েছিল।

সন্ধ্যের পর খুব জরুরী 'কল' না থাকলে আমি কোথাও বেরুতাম না। সাধারণত সন্ধ্যের পর বড় বড় অফিসাররা ক্লাবে যেতেন। সেকালে সাহেবদেরই প্রাধান্য ছিল। সাহেবরাই ডিস্ট্রিক্ট অফিসারের পদ অলঙ্কৃত করতেন। আমাদের মতো 'নেটিভ্' থাকতো তু'-একজন। এদের মধ্যে কেউ কেউ ক্লাবেও যেতো সাহেবদের খোশামোদ করবার জন্যে, আবার কেউ কেউ যেতো মদ খাবার লোভে। বাড়িতে বসে মদ খাবার তাগদ অনেকেরই ছিল না সেকালে। একালেও নেই। এই জন্যেই হোটেল আর ক্লাবগুলো টিকে আছে সম্ভবত। আমি ক্লাবে যেতাম না। মাঝে মাঝে তু'এক চুমুক ব্র্যাণ্ডি খাবার ইচ্ছে হ'লে ঘরে বসেই খেতুম। সন্ধ্যাবেলা আমার একমাত্র কাজ ছিল স্নান করে' ভাল এক কাপ চা খেয়ে একটি ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বই পড়া। সেদিন তা না করে' গেলুম ওই মেয়েটির কাছে। ফিরে এসেই এস-পি'কে ফোন করেছিলাম, ফোনেই সব কথা খুলে বলেছিলাম তাকে। সে আমাকে বললে, "আমি সেখানে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

সেখানে গিয়ে দেখলুম, শুধু সে কড়া পাহারারই বন্দোবস্ত করেনি, বাড়ি-উলীকে অ্যারেস্ট করে' নিয়ে গেছে। কপাটে কয়েকবার ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি করার পর সে কপাট খুলে দিলে। অগাধে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল।

"কি খবর, ঘুমুচ্ছিল? বেশ। কেউ বিরক্ত করেনি তো।"

তার মুখেই শুনলুম বাড়ী-উলীকে থানার দারোগা এসে ধরে' নিয়ে গেছে।

"এইবার তোমার ব্যাপারটা কি! বলতো শুনি—"

মেয়েটি অনেকক্ষণ ধরে' থেমে থেমে যে কাহিনীটি বললে তা যেমন করুণ, তেমনি নিষ্ঠুর।

হুগলী জেলার এক গ্রামে ওর বাড়ী, জাতে কৈবর্ত। বিধবা মা ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। গ্রামে মেয়েদের একটা স্কুল ছিল, সেই স্কুলে সে পড়তে যেত, অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য মেয়েও পড়ত সে স্কুলে। পড়াশুনা ওর তত ভালো লাগত না। ওর কেবলি মনে হত কবে আমার বিয়ে হবে। কবে আমি মায়ের দুঃখ ঘোচাতে পারব। ছেলে হয় নি বলে' তার মায়ের মনে একটা দুঃখ ছিল। প্রায়ই সে এ কথা বলতো। বলতো, "যদি পেটের একটা ছেলে থাকত তা হলে তার বিয়ে দিতুম, নাতি নাতনিতে ঘর ভরে যেত। আর মেয়ে তো পরের জন্যেই মানুষ করা। কাকের বাসায় কোকিলের ছানার মতো। বড় হলেই পর হয়ে যাবে। ওর ছেলে-মেয়ে ওর কাছে থাকবে, সে কি আমার ঘর আলো করতে আসবে।" সে তখন তার মাকে আশ্বাস দিয়েছিল, আমার প্রথম সন্তান, তা সে ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, তোমাকেই দেবো আমি। ঠিক দেবো, দেখো—"

তার সহপাঠিনীদের একে একে বিয়ে হয়ে যেতে লাগল। কি চমৎকার বর তাদের। কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল, কেউ মাষ্টার। আর কি সব চেহারা! দেখে চোখ ফেরানো যায় না।

তার কিন্তু আর বিয়ে হয় না। ভাল ছেলেই কোথাও পাওয়া গেল না। একটি ভালো ছেলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু তারা এত টাকা চেয়ে বসল যে সাধ্যে কুলাল না তার মায়ের। বয়স বাড়তে লাগল। চৌদ্দ, পনের, ষোল, তবু তার বিয়ে হলো না। স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিল সে। রাস্তায় বেরুতে লজ্জা করতো। পাড়ার বখাটে ছেলেগুলো জ্বালাতন করতো রাস্তায় বেরুলে। ছড়া

কাট্‌ত, শিস দিত। বাড়ীতেই দিনরাত থাকতে লাগল সে। বাড়ীতে বসে' ওই একটি চিন্তাই সে দিনরাত করতো, কবে তার বিয়ে হবে, কবে তার নিজের ঘর হবে, ছেলে হবে, কবে সে মাকে তার একটি ছেলে দিতে পারবে। এইভাবেই দিন কাটছিল, এমন সময় সর্বনাশ হয়ে গেল। তাদের ঘরে সিঁদ কেটে চোরে নিয়ে গেল তাদের যথাসর্বস্ব। তার মায়ের যা দু'-একখানা গয়না ছিল, ভালো কাপড় ছিল, যার উপর নির্ভর করে মা ভেবেছিল তার বিয়ে দেবে, তা সমস্ত চুরি হয়ে গেল। বিয়ের আশা নির্মূল হয়ে গেল একেবারে। বিনা পয়সায় এদেশে মেয়ের বিয়ে হয় কি কখনও? পাশের গাঁয়ে থানা, সেখান থেকে দারোগাবাবু এলেন চুরির তদন্ত করতে। আমাকেই বেশি করে' জেরা করতে লাগলেন। আমি কোথায় শুয়েছিলাম, রাত্রে কোন শব্দ শুনেছিলাম কিনা, বাড়ীর আশেপাশে কোন লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি কি না, আমাদের বাড়ীতে কারা আসে—এইসব। তারপর থেকে দারোগাবাবু রোজই আসতে লাগলেন, আর আমাকে ডেকে সামনে বসিয়ে নানা কথা জিগ্যেস করতে লাগলেন। দিনকতক পরে তাঁর আসল মতলবটি বোঝা গেল। তিনি মাকে একদিন বললেন, আমি আপনার স্বজাতি। চুরির কোন কিনারা করতে পারলুম না, তবে আপনার একটি উপকার আমি করতে পারি। আপনার মেয়ের এখনও বিয়ে হয়নি, আমারও বিয়ে হয়নি, আপনার মেয়েটিকে আমার পছন্দ হয়েছে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, ওকে আমি বিয়ে করতে পারি। আপত্তি? মা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। শুধু মা নয়, আমিও। কি সুন্দর সুপুরুষ, তার উপর দারোগা। দারোগা বাবু কিন্তু বললেন যে এখনই তিনি বিয়ে করতে পারবেন না, কারণ তাঁর এক কাকা মারা গেছেন, কালাশৌচ চলছে, সেটা শেষ হয়ে গেলে তবে বিয়ে হবে। খুবই সঙ্গত

কথা। বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে রইল। দারোগাবাবু প্রায়ই আসতে লাগলেন এবং আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে লাগলেন যেন আমি তাঁর বউ হয়ে গেছি। রোজই জিনিষ-পত্র পাঠিয়ে দিতেন, মাছ, দই, দুধ, তরিতরকারি।

মাকে টাকাও দিতেন মাঝে মাঝে। আমরা যা কখনও কল্পনাও করিনি তাই ঘটতে লাগল। এইভাবেই চলছিল, কিন্তু মাসখানেক পরে দারোগাবাবু আরো বেশি দাবী করলেন আমার উপর। একদিন একটা পালকি পাঠিয়ে দিলেন। একটা চাকর চিঠিও নিয়ে সঙ্গে এসেছিল। মায়ের নামে চিঠি। মা তো পড়তে জানে না, আমিই পড়লাম। লিখেছেন, "আমি কদিন থেকে জ্বরে পড়ে আছি। ওকে যদি পাঠিয়ে দেন ভালো হয়। পালকি পাঠালাম।" মা একটু বিপদে পড়ে গেলেন। যাওয়াটা ভালো দেখায় না। অথচ এতবড় একটা হিতৈষী বন্ধুর এ অনুরোধ অগ্রাহ্য করাও শক্ত, বিশেষতঃ সে যখন হবু জামাই। আমাদের সৌভাগ্যে পাড়ার লোকেরা হিংসেতে ফেটে পড়ছিল। সুতরাং তাদের সঙ্গে কোন পরামর্শ করতে যাওয়া বৃথা মনে হল।

মা খানিকক্ষণ ভাবলেন, শেষে বললেন, 'চল, আমিও তোর সঙ্গে যাই। যদিও সে আমাকে যেতে বলেনি, কিন্তু তোকে একা পাঠাই কি করে?" আমার সঙ্গে মাও গেলেন। আমরা গিয়ে দেখলাম সত্যিই তাঁর একটু জ্বর হয়েছে। কিন্তু এমন বাড়াবাড়ি কিছু নয়। দারোগাবাবু মায়ের দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি কেন এলেন কষ্ট করে'? তা এসেছেন বেশ করেছেন, থাকুন।"

মা আর আমি দুজনেই তাঁর বাসায় থাকতে লাগলুম। আমার কিন্তু বড় অস্বস্তি লাগতো, কারণ আমাকে আড়ালে পেলেই দারোগাবাবু এমন সব অসভ্য ইঙ্গিত করতেন যে আমার লজ্জাও করতো, খারাপও লাগতো। কিন্তু কি করব, আমরা সঙীন ফাঁদে পা

দিয়েছিলুম। পালাবার উপায় ছিল না। শেষকালে দারোগাবাবু মাকে বুঝিয়ে দিলেন যে আমি যদি তাঁর কাছে স্ত্রীর মতো থাকি তা হলেই বা ক্ষতি কি। কিছুদিন পরে শাস্ত্রমতো বিয়ে তো হবেই। মা মত দিয়ে দিলেন এতে। না দিয়ে উপায় ছিল না। গরীব পাড়াগেঁয়ে মূর্খ বিধবা, দারোগার বিষদৃষ্টিতে পড়বে কোন্ সাহসে। একদিন মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তিনি বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। কিছু টাকাও নাকি দিয়েছিলেন। টাকা বড় অদ্ভুত জিনিষ ডাক্তারবাবু। টাকার লোভে মাও নিজের সন্তানকে বিক্রি করে' দেয়। মা টাকা পেয়ে চলে গেলেন।"

আমি বললুম, "টাকার লোভে তুমিও তো এই নরকে এসেছ।"

"না, আমি টাকার লোভে আসিনি। আমি ঘর বাঁধার আশায় এসেছিলাম। মাকে আমি দোষ দিচ্ছি না, তাঁর মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। আমাদের সমাজই এমনি, সমাজই আমাকে তুলে দিলে ওই দারোগাটার হাতে। আমরা তো বেশি কিছু চাইনি। ছোট একটি সংসার পাততে চেয়েছিলাম, ছোট একটু বাসা, আর কিছু নয়—"

হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েকটা লাইন মনে পড়ে গেল—'ধন নয়, মান নয়, এতটুকু বাসা, করেছিনু আশা।' কিন্তু সে কথা আর তাকে বললুম না। যদিও বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, যা তুমি চেয়েছিলে তা দুর্লভ এদেশে। রবীন্দ্রনাথের মতো লোক যা জোগাড় করতে পারেননি, তা তুমি পারবে কি করে'। ছোট বাসা ছোট নয়, অনেক বড়। শান্তিপূর্ণ ছোট একটু বাসা জোগাড় করা অসম্ভব এদেশে। তার চেয়ে তাজমহল হোটেলে ফ্ল্যাট ভাড়া করা সহজ।

"তারপর?"

"তারপর যা ঘটবার তাই ঘটল। কিছুদিন পরেই বুঝতে পারলুম পেটে ছেলে এসেছে। তখনও বিয়ে হয়নি।"

"শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়েছিল কি?"

"না, পরে শুনলুম, উনি বিবাহিত। জাতেও কৈবর্ত নন, উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ। তিন চারটি ছেলেমেয়ে আছে ওঁর।"

"কি করে খবরটা পেলে?"

"থানার এক হাবিলদার ছিলেন রমজান আলী। দারোগা-সাহেব একদিন টুরে বেরিয়েছিলেন। সেদিন তিনি আমাকে ডেকে সব কথা খুলে বললেন, রমজান আলী অবশ্য নিঃস্বার্থভাবে আমার উপকার করবার জন্যে একাজ করেননি। তাঁরও লোভ ছিল আমার উপর। তিনি দারোগাবাবুর স্ত্রীর ঠিকানাও এনে দিলেন আমাকে। বললেন, 'আমার কথা বিশ্বাস না হয় তাঁকে চিঠি লিখলেই সব জানতে পারবেন। তিনি অসুস্থ, ধরমপুর স্যানা-টোরিয়মে থাকেন।' এ শুনে আমার মনের যে কি অবস্থা হল তা বুঝতেই পারছেন। স্যানাটোরিয়মের ঠিকানায় চিঠি লিখলাম একটা। সব কথা খুলেই লিখলাম। রমজান আলী ঠিকানা লিখে চিঠিখানা পোষ্ট করে দিয়ে এলেন।

চিঠির উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আমি দারোগাবাবুকে আর কিছু বললাম না। ভাবলাম, ঠিক খবর আগে জানা দরকার। আমার মনে ক্ষীণ একটা আশা ছিল খবরটা মিথ্যে হবে। কিন্তু হল না, দারোগাবাবুর স্ত্রী তাঁর তিনটি মেয়ে আর একটি ছেলে নিয়ে সশরীরে এসে পড়লেন একদিন। এসেই তিনি কি করলেন জানেন? আমাকে ঝাঁটা-পেটা করে বাড়ি থেকে বের করে' দিলেন। পেটে এমন লাথি মারলেন যে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

ওই রমজান আলীই শেষে আশ্রয় দিলে আমাকে, হাসপাতালে নিয়ে গেল, অনেক সেবা-শুশ্রূষাও করলে। পেটের ছেলেটা কিন্তু

বাঁচল না। মাও খবর পেয়ে হাসপাতালে এল। রোজ আসত। এসে কাঁদত খালি। কোন কথা বলত না, খালি কাঁদত। রমজান আলী আমার জন্য অনেক টাকা খরচ করেছিল। শেষকালে সে এক কাণ্ড করে' বসল। মাকে হাত করে' সে এক মোকর্দ্দমা রুজু করিয়ে দিলে দারোগার নামে। উপরওলার কাছে এক দরখাস্ত করে' দিলে মায়ের নাম দিয়ে। উপর থেকে সায়েব এলেন, আমার সাক্ষী নিলেন, মায়ের সাক্ষী নিলেন। হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর সাক্ষী নিলেন। ফলে দারোগাবাবুর শুধু চাকরীই গেল না, দু'বছর জেল হয়ে গেল। দারোগাবাবু জেলে যাবার পর আমি পড়লাম রমজান আলীর পাল্লায়। রমজান আলী মাকে বললে, "দেখ, তোমার মেয়ের চিকিৎসার জন্যে, মোকর্দ্দমার জন্যে আমার দুহাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। আমার যা কিছু পুঁজি ছিল সব নিঃশেষ করেছি ওর জন্যে। তোমার মেয়েটি আমাকে দাও। ও এমনিই আমার কাছে থাকতে পারে, কিম্বা যদি বল ওকে বিয়েও করতে পারি। অবশ্য আমার আরও দুটো বিবি আছে, কিন্তু আমাদের সমাজে বহু বিবাহে দোষ নেই। আর এতে যদি তোমরা রাজি না থাক, তোমার মেয়ের জন্যে যে টাকা আমি খরচ করেছি সেটা আমাকে ফেরত দাও।"

মা আমাকে আড়ালে ডেকে জিগ্যেস করলেন, "কি করবি?"

বললাম, "আমি ওর কাছে থাকব না, বিয়েও করব না, চল বাড়ী ফিরে যাই।"

মা বললেন, "কিন্তু সেখানে কি আর মুখ দেখাবার উপায় আছে? ঢিঢিক্কার পড়ে গেছে চতুর্দিকে।"

"তা হলে চল অন্য কোথাও যাই। আমি তোমাকে ভিক্ষে করে' খাওয়াব। কিন্তু মুসলমান হ'তে পারব না—"

"মুসলমান হলেই বা ক্ষতি কি। হিন্দুরাই কি তোমাকে

মাথায় করে' রেখেছে ? না রাখবে ? দুপায়ে তো খালি থ্যাংলাচ্ছে। হিন্দু থেকেই তোমার বিয়ের চেষ্টা করলুম এতদিন, কিন্তু পেলুম কি একটাও ভালো ছেলে ? তোমাকে শেষকালে যে নষ্ট করলে সে-ও হিন্দু। ঝাঁটা মারি এমন হিন্দু সমাজের মুখে—"

আমি কিন্তু তবু রাজি হ'তে পারলাম না। মা শেষে রেগে-মেগে চলে গেল। রমজান আলীকে বলে' গেল বটে যে আমি তোমার টাকার জোগাড় করতে যাচ্ছি—কিন্তু সেটা স্তোকবাক্য।

রমজান আলী আমাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল, আমি কিন্তু কিছুতেই রাজী হলাম না। মাকে যদিও বলেছিলাম যে ও মুসলমান বলে আমার আপত্তি কিন্তু আমার আপত্তি ছিল অন্য জায়গায়। আমি এটা ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম যে-ঘর আমি বাঁধতে চাইছি, যা আমার জীবনের স্বপ্ন, তা ওকে বিয়ে করলে আমি পাব না। রমজান আলী বললে, "আমাকে বিয়ে যদি না কর আমার টাকা ফেরত দাও। তোমার মা তো পালিয়েছে, আর এও জানি তার কাছে একটি কানা-কড়িও নেই—"

বললুম, "আমি রোজগার করে' তোমার টাকা শোধ করে' দেব। তুমি কোথাও আমার চাকরির ব্যবস্থা করে' দাও। তুমি যখন আমার জন্যে এতই করেছ—এটাও করে' দাও দয়া করে'।"

সে বললে, "এখানে চাকরি হবে না তোমার। এখানে কে তোমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেবে! আমার সঙ্গে বিদেশে যদি যাও সেখানে কিছু ব্যবস্থা হ'তে পারে।"

আমি রাজি হ'য়ে গেলাম এতে। দিন সাতেক পরে রমজান আলী বললে, "আমি ছুটি নিয়েছি। চল, তোমাকে পশ্চিমের একটা শহরে নিয়ে যাই। সেখানে আমার এক চেনা-শোনা আত্মীয়া আছে, তার কাছে তোমাকে রেখে দেব, সে তোমার রোজগারের ব্যবস্থা করে' দেবে।

সাতদিন আগে রমজান আলী আমাকে এই বাড়িউলীর হাতে সঁপে' দিয়ে চলে' গেছে। তারপর থেকে আমার উপর যা নির্যাতন হচ্ছে তা তো আপনি সব শুনেছেন—"

জিগ্যেস করলুম, "রমজান আলীও কি তোমার উপর অত্যাচার করেছিল ?"

"করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। আমি চেঁচামেচি করে' উঠতেই ছেড়ে দিয়েছিল। তারপরই এখানে নিয়ে এল—"

বুঝলাম বদমাইস ঘোড়াকে 'ব্রেক' করবার জন্য ঘোড়ার ব্যবসাদাররা যে কৌশল অবলম্বন করে, রমজান আলী তাই করেছে।

জিগ্যেস করলাম—"আমার কাছে তুমি কি চাও ? যদি সাধ্যের মধ্যে হয় নিশ্চয়ই করব—"

"আমি একটি ছোট্ট ঘর বাঁধতে চাই ডাক্তারবাবু। আপনি দয়া করে' সেই ব্যবস্থা করে দিন। জাতের বিচার আমার আর নেই। যে কোনও লোক ভদ্রভাবে স্ত্রীর মতো যদি আমাকে রাখে আমি তার কাছেই থাকব। সে যদি বিয়ে করে ভালোই, না-ও যদি করে তাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু তার বাড়ীতে আমি ভদ্রভাবে থাকতে চাই। আছে এরকম কোনও লোক আপনার জানা ? আপনারা তো কত জায়গায় ঘোরেন, এরকম লোক চোখে পড়েনি আপনার ? আমাদের দেশে একটাও ভদ্রলোক নেই এ কি হ'তে পারে ? দয়া করে' দেখুন না একটু চেষ্টা করে'—?

তার মিনতিটা যেন কান্নার মতো শোনাতে লাগল। কিন্তু আমি তখন মহাসমস্যায় পড়লুম। এই বিরাট কসাইখানায় জীবন্ত একটি নধর পাঁঠা পাই কোথায় ! একটাও তো বেঁচে নেই।

"আচ্ছা, চেষ্টা করব"—বলে' সেদিন চলে এলাম। পুলিশ পাহারা ছিল, সুতরাং অন্য কোন ভয়ের কারণ ছিল না। তা ছাড়া বাড়িউলী ছিল হাজতে !

তার পরদিনই আমার কাছে সোহনলাল এল। কাক-তালীয়ই বল, আর যাই বল। এই রকম আকস্মিক অপ্রত্যাশিত যোগাযোগই পৃথিবীর ইতিহাসে যুগান্তর এনেছে। টেলিফোন, এক্স্-রে প্রভৃতি এর উদাহরণ। সোহনলালকে দেখেই আমার মনে হল, বিধাতা বোধ হয় ওই মেয়েটার এইবার একটা গতি করে দিলেন।

সোহনলালের পরিচয়টা শোন আগে। সোহনলালকে দেখলেই মনে হয় সে একজন 'রইস' অর্থাৎ অভিজাত বংশের ছেলে। পরনে ভালো কাপড়, ভালো জুতো, ভালো পাঞ্জাবী। সিল্কের বা আদ্দির পাঞ্জাবী ছাড়া অন্য কোন পাঞ্জাবী তাকে পরতে দেখিনি কখনও। মাথায় ফুলদার বিহারী-টুপি, একটু বাঁকা করে' পরা, গোঁফটি চমৎকার, সুপালিত, সুলালিত। শুধু কালো নয়, চক্‌চকে কালো, ডগা দুটি ফণার মতো। দোহারা গড়ন, বেশ লম্বা চওড়া। কানে আতরসিক্ত তুলো থাকত সর্বদা। পানও খেত সুগন্ধী জরদা দিয়ে। মাথার সামনের দিকে ঈষৎ টাক ছিল। চোখ ছোট ছোট ছিল, কিন্তু সর্বদা হাসিতে চিকমিক করতো বলে' খারাপ দেখাত না।

সে জমিদার বা জমিদারের ছেলে ছিল না। ছিল স্থানীয় মহাবীর প্রেসের হেড মেশিন ম্যান। ছেলেবেলায় বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছিল বিলেত যাবে বলে। কিন্তু বিলেত পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। আট্‌কে গিয়েছিল বম্বেতে। সেইখানে এক বিলিতি প্রেসের সাহেব ম্যানেজারের সুনজরে পড়ে' প্রেসে ঢুকে মেশিনের কাজ শেখে। নিখুঁতভাবে শিখেছিল কাজটি। মহাবীর প্রেসের সেই ছিল আসল পরিচালক। প্রেসের মালিক মহাবীর ঝুন্‌-ঝুন্‌-ওয়ালা মাসে আড়াই শো টাকা মাইনে দিয়ে ওর কাছে হাত জোড় করে' থাকত, কারণ সোহনলাল না থাকলে প্রেস অচল।

সোহনলাল বাস করত চামার পাড়ায়, তাদের সঙ্গেই ওর আত্মীয়তা ছিল বেশি। চামার রোগীদের নিয়ে আমার কাছে আসত বলেই আমার সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল।

ওর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল কয়েকটি। ঘুড়ি ওড়াতো। ঘুড়ি তৈরি করতো, ঘুড়ি আনাতোও নানা জায়গা থেকে নানা রঙের, নানা মাপের। ওর লাটাইটি ছিল দেখবার মত, চমৎকার কারুকার্যে অলঙ্কৃত। ভালো সুতো, সুতোর মান্‌জা, এই সবের ব্যবস্থা করতো চামারের ছেলেমেয়েগুলো, ওদেরও প্রত্যেককে ঘুড়ি লাটাই কিনে দিয়েছিল সে। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রোজ ঘুড়ি ওড়াতো। ওর আর একদল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল শাহসাহেবের ছেলেরা, তারা লক্ষ্ণৌ কায়দায় ঘুড়ি ওড়াতো।

ওর দ্বিতীয় শখ ছিল পাখী আর পায়রা পোষার। প্রতি বছর হরিহর-ছত্রের মেলায় গিয়ে পাখী কিনে আনতো। কাকাতুয়া, টিয়া, ময়না, হরেক রকমের। পায়রাও নানা জাতের।

প্রেস থেকে ফিরে এই সব নিয়েই মশগুল হ'য়ে থাকত সোহনলাল। আর ওর সঙ্গী সহচর ছিল ওই চামারগুলো। সন্ধ্যে হলেই মদ নিয়ে বসতো। যতক্ষণ না অজ্ঞান হ'য়ে যেতো ততক্ষণ মদ খেতো বসে'। এই ছিল ওর দিবা-রাত্রির কার্যক্রম।

বিয়ে করেছিল। একবার নয়, দু'বার। কিন্তু দুটো বউই পালিয়েছিল। বউরা সাধারণত চায় স্বামীরা স্বপনে-জাগরণে সব সময়ে তাদের কথাই ভাবুক, কিন্তু এরকম অখণ্ড মনোযোগ দেওয়া সোহনলালের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার ঘুড়ি, পায়রা, কাকাতুয়া, টিয়া, ময়না, মদ, আর চামারদের ছেলেমেয়েরা তার মনের অনেক-খানি দখল করে রেখেছিল অনেক আগে থেকেই। ওর বউদের এটা ভালো লাগেনি সম্ভবত। বউদের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারে এমন লোকেরও অভাব ঘটে নি, তারা তাদের সঙ্গেই ভেগেছিল।

এতে কিন্তু আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল সোহনলালের। আর মনে হয়েছিল, লোকে তাকে হয়তো নপুংসক মনে করছে। তার নিজেরও একটু সন্দেহ হয়েছিল বোধ হয়। কারণ সে আমার কাছে এসে নিজেকে ভালো করে' পরীক্ষা করিয়েছিল যে তার পারুষ্যে কোন রকম দুর্বলতা আছে কিনা। আমি পরীক্ষা করে' দেখেছিলাম, নেই। সুযোগ পেলে সে অনায়াসে শতপুত্রের পিতা হ'তে পারে।

সেদিনও সোহনলাল এসেছিল একটি চামার ছোকরাকে নিয়ে। ছোকরা তাড়ি খেয়ে মারামারি করে' হাত ভেঙেছে। তার হাতের ব্যবস্থা করে' দিয়ে সোহনলালকে বললুম, 'তুমি একটু বস, তোমার সঙ্গে কথা আছে একটু।'

সব খুলে বললুম তাকে।

সে বললে, "হুজুর, আমি মেশিন বুঝি, ঘুড়ি বুঝি, চিড়িয়া বুঝি, এই সব চামারদেরও বুঝি, কিন্তু আওরৎকে বুঝি না। দু'বার বোঝবার চেষ্টা করেছি পারিনি। ওরা আজব ধরনের মেশিন। আমাকে মাফ করুন ডাক্তার সাহেব।"

আমি বললুম, "কিন্তু আমার মনে হয় একে তুমি বুঝতে পারবে, কারণ ও নিজেকে বোঝাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। তুমি যদি ওকে ভদ্রভাবে ঘরে স্থান দাও, ও তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে। জীবনে ও কেবল অভদ্র লোকেদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে। তোমার মতো ভদ্র 'রইস্' যদি ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে তাহলে বর্তে যাবে ও—"

সোহনলাল দোনো-মোনো হ'য়ে চুপ করে' রইলো।

"ও পতিতা বলে আপত্তি করছো?"

"না। জাতের বিচার আমার নেই। আমি জানি ময়লা বাসন ধুয়ে নিলেই পরিষ্কার হয়ে যায়। আমার মেশিনে তো রোজই

ময়লা জমে, রোজই সাফ করতে হয়, তবে ভয় হয়, কোন খারাপ অসুখ টসুখ নেইতো—"

"সে আমি দেখে দেবো। অসুখ থাকলেও তা সারিয়ে নেওয়া অসম্ভব নয়—"

"হ্যাঁ, মেশিনও ভেঙ্গে যায়, সারাতে হয়।"

সোহনলাল মেশিনের উপমা দিয়েই কথাবার্তা চালাতে লাগল।

বললাম, "তুমি আগে তাকে দেখ একবার, যদি পছন্দ হয় ঘরে নিয়ে যেও। ওর কোন অসুখ টসুখ আছে কিনা তা আমি দেখে দেবো।"

"বহুত খুব"

সেলাম করে চলে গেল সোহনলাল।

সেই দিনই সন্ধ্যের সময় নিয়ে গেলুম তাকে সরস্বতীর কাছে। মেয়েটির নাম ছিল সরস্বতী। তাকে দেখে সোহনলাল আর "না" বলতে পারল না। সত্যই মেয়েটি অপরূপ লাবণ্যময়ী ছিল, বিশেষত যৌবনের অমন প্রবল প্রকাশ ক্বচিৎ চোখে পড়ে।

সেই দিনই সোহনলাল সরস্বতীকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। প্রতিশ্রুতি মতো সরস্বতীকে পরীক্ষা করে' দেখে ছিলাম, কোন অসুখের চিহ্ন দেখতে পাই নি। রক্তও পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছিলুম, কোন দোষ পাওয়া যায় নি।

সোহনলালের সঙ্গে সরস্বতীর বিয়েও হয়েছিল একটু নতুন ধরনের। পুরুত টুরুত ডাকা হয়নি। মন্ত্রও পড়া হয়নি। সোহনলালের বাড়ীর কাছে একটা শিব-মন্দির ছিল। সেই শিব-মন্দিরে গিয়ে শিবের মাথায় হাত রেখে তারা শপথ করেছিল যে, তারা আমরণ পরস্পরের সুখ-দুঃখের অংশী হবে। কেউ কাউকে প্রতারণা করবে না।

এ শপথ রক্ষা করেছিল তারা। শুধু তাই নয়, সোহনলালকেও বদলে দিয়েছিল সরস্বতী। কিছুদিন পরে শুনলাম সোহনলাল মদ ছেড়ে দিয়েছে। বিয়ের মাসখানেক পরে একদিন তাদের বাড়ি গিয়ে দেখলুম, সোহনলাল পূজো করছে।

সরস্বতী হেসে বললে—"উনি আমাকে ঘুড়ি ওড়াতে শিখিয়েছেন, আমি ওঁকে পূজো করতে শিখিয়েছি। আমরা দুজনেই এখন ঘুড়ি ওড়াই, দুজনেই পূজো করি।"

দেখলুম ঘরের শ্রী-ও ফিরিয়ে ফেলেছে সে। উঠোনে একটি তুলসী গাছ। পাখীর খাঁচাগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কাঁসার বাসনগুলি ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। পরিষ্কার কাপড়গুলি পাট করে' আলনায় রাখা। প্রকাণ্ড উঠোনটা আগে শ্রীহীন হয়ে পড়ে' থাকতো, এখন গোবর দিয়ে নিকিয়ে তার চেহারাই বদলে দিয়েছে সরস্বতী। উঠোনের একধারে কয়েকটা ফুলের গাছও দেখলাম। গাঁদা, সন্ধ্যামণি, রজনীগন্ধা। মনে হ'লো—যাক্, সরস্বতী এবার তার মনের মত ছোট একটা বাসা পেয়েছে তাহলে।

সোহনলাল একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। দেখলাম সে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে বাস করছে। জিগ্যেস করলাম, "মদ ছেড়ে তোমার কষ্ট হচ্ছে না?"

সে বললে, "দু'চার দিন হ'য়েছিল। কিন্তু কষ্ট হ'লই বা! সরস্বতীর জন্যে একটু কষ্ট সইতে যদি না পারলাম, তবে আর কি পারলাম! আমার ওই মেশিনের জন্যে কষ্ট করতে হয় না? এমন দিনও গেছে যখন সমস্ত দিন না খেয়েও সেবা করেছি। যাকে ভালোবাসি তার জন্যে কষ্ট করতে হয় বই কি। কিন্তু আমি যে জন্যে আপনার কাছে এসেছি সেইটে আগে বলি। সরস্বতীর খুব ইচ্ছে কোনও একটা পূজো করে। দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী—আপনি যা বলবেন। সরস্বতী আপনাকেই জিগ্যেস করতে বলেছে"।

বললাম, "দুর্গা কালীর দরকার কি, ওর নাম সরস্বতী, সরস্বতী পূজোই করুক—"

"ঠিক বলেছেন"

মহাসমারোহে সরস্বতী পূজো হ'ল। শুধু আমি নয়, শহর-সুদ্ধ লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিল। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, চামার, সব।

আরও মাস দুই পরে শুভ সংবাদটি জানতে পারলাম। সরস্বতী অন্তঃস্বত্বা।

যথাসময়ে সুন্দর একটি ছেলে হ'ল। আবার একচোট সবাইকে খাওয়ালে সোহনলাল।

মাস কয়েক পরে বদলি হয়ে গেলাম আমি সেখান থেকে। ওদের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার মতো হ'য়ে গিয়েছিল। ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়েছিল বেশ। যাবার সময় বলে গেলুম, মাঝে মাঝে তোমাদের খবর দিও।

বছর খানেক পরে হঠাৎ সোহনলাল নিজেই সশরীরে এসে হাজির হ'ল একদিন।

বললে—"সরস্বতীও ভেগেছে"

"বল কি!"

"হ্যাঁ হুজুর। আমি আগেই আপনাকে বলেছিলুম, মেয়েমানুষ এক আজব মেশিন"

"কোথায় গেছে তা জান?"

"কিছু বলে যায়নি কাউকে। ছেলেটাকেও নিয়ে গেছে"।

"তোমার সঙ্গে ঝগড়া টগড়া হয়েছিল?"

"কিচ্ছু না"

একটু চুপ করে' থেকে বললে, "আপনি কি ওর দেশের ঠিকানা জানেন ?"

ঠিকানা সংগ্রহ করবার আমার বাতিক নেই।

বললাম, "না, ঠিকানা তো জানি না"।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ এইজন্যই বোধ হয় অজ্ঞাত-কুলশীলদের সম্বন্ধে আমাদের সাবধান করে গেছেন। কিন্তু সরস্বতী যে এমন দাগা দেবে তা ভাবতে পারিনি।

খানিকক্ষণ বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে থেকে সোহনলাল চলে গেল।

মাস তিনেক পরে সরস্বতীর চিঠি পেলাম একখানা। বানান-ভুলে পরিপূর্ণ বাংলায় লেখা চিঠি। চিঠিতে যা লিখেছিল তা শুদ্ধ করে' লিখলে এই দাঁড়ায়।

শ্রীচরণেষু,

না জানি আপনি আমার সম্বন্ধে কি ভাবছেন। কিন্তু কি হয়েছিল শুনুন। আপনার মনে হয়তো আছে, আমি আপনাকে বলেছিলাম যে আমি মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে আমার প্রথম সন্তান মাকে দিয়ে দেবো। আমার ছেলে যখন বড় হ'তে লাগল তখন বার বার এই প্রতিজ্ঞার কথাটা আমার মনে হ'ত। মায়ের জন্যে মন কেমন করতো খুব, তবে মনকে স্তোক দিতুম যে মা বোধ হয় বেঁচে নেই। কিন্তু স্তোক দেওয়া আর চলল না। হঠাৎ রাস্তায় আমাদের গাঁয়ের নবীন স্যাকরার সঙ্গে দেখা হ'ল একদিন। সে এক বিয়েতে বরযাত্রী এসেছিল। সে বললে, মা বেঁচে আছে, আর আমার জন্যে রোজই নাকি কান্নাকাটি করে।

ওঁকে পাকে-প্রকারে একদিন জিগ্যেস করলুম, আচ্ছা, খোকনকে যদি আমি আমার মায়ের কাছে দিয়ে দি তা হ'লে তুমি

কি আপত্তি করবে ? উনি বাঘের মত গর্জন করে' উঠলেন। আমার এও মনে হ'তে লাগল, আমার ছেলে যদি এখানে মানুষ হয় তাহ'লে ওর সঙ্গী হবে ওই চামারের ছেলেমেয়েগুলো। এই সব ভাবছি এমন সময় আবার একদিন নবীন স্যাকরার সঙ্গে দেখা হ'ল। সে বল'লে, মা-ই তাকে এবার পাঠিয়েছে। আমি যেন ওঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে' আসি মায়ের সঙ্গে। উনি তখন বাড়ি ছিলেন না, প্রেসে গিয়েছিলেন। আমি ভাবলুম, উনি ফিরলে ওঁকে জিগ্যেস করে তবে যাব। কিন্তু আবার ভয় হ'ল উনি যদি যেতে না দেন। নবীন স্যাকরা বলে, 'যাবে তো চল, তিনটের সময় গাড়ি। আমি তোমার মায়ের কাকুতি মিনতিতে একটি দিনের জন্যে এসেছি। যদি না যাও আমি আজই চলে যাব। অনেক কাজ পড়ে আছে আমার।' শেষে চলেই গেলুম ওর সঙ্গে। কাজটা খুবই অন্যায় হয়েছিল বুঝতে পারছি। কিন্তু যখন কুমারী ছিলাম, তখন মাকে যে কথা দিয়েছিলাম, সেটা যদি না রাখি তাহলে কি সত্যভঙ্গ হয় না ? তাছাড়া যে ছেলেকে আমি দশমাস পেটে ধরেছি, বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করেছি, তার উপরে আমার কি কোন অধিকার নেই ? সব অধিকার ওঁর ? পাকে-প্রকারে একদিনই কথাটা পেড়ে বুঝেছিলাম ওঁর কি মনোভাব। তাই বাড়িতে এসেও তাঁকে ভয়ে আর খবর দিতে পারিনি। যদি এসে হৈ-হল্লা করেন, তাহলে গাঁয়ের ভেতর সে এক বিশ্রী কাণ্ড হবে। একে আমাকে নিয়ে আগে নানা কাণ্ড হয়েছে। আমি আর একটা কথাও ভেবেছিলুম, মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমার কাছেই নিয়ে যাব। তা হ'লে দু-কুলই বজায় থাকবে। কিন্তু তাও হ'ল না। মা, বাস্তু ভিটে ছেড়ে আসতে রাজি হ'ল না কিছুতেই। আর আমার ছেলেটির সঙ্গে ইতিমধ্যেই মা বেশ ভাব করে' ফেলেছিল, সে রাত্রে তাঁর কাছে শুতো। মাস-খানেকের মধ্যে খুব ন্যাওটা হ'য়ে পড়ল। তখন আমি ভাবলুম,

এইবার ফিরে যাই। উনি হয়তো একটু রাগ টাগ করবেন, কিন্তু পায়ে ধরলে আমার মনের কথাটা বুঝবেন হয়তো। মায়ের কাছে ছেলেকে রেখে একাই ফিরে গেলুম। গিয়ে দেখি আমাদের বাড়িতে আর একজন লোক রয়েছে। চামারেরা বললে, আমি চলে যাওয়ার দিন পনেরো পরেই উনি প্রেসের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সব জিনিসপত্র জলের দামে বিক্রী করে' চলে গেছেন। কোথায় গেছেন কেউ জানে না। মহা আতান্তরে পড়লুম। কেউ কেউ বললে কলকাতা গেছেন, কেউ বললে বোম্বাই। একবার ভাবলুম বাড়িতে ফিরে যাই আবার। কিন্তু মাসখানেক মায়ের কাছে থেকেই পাড়ার ছোঁড়াগুলোর, বিশেষত জমিদারের নায়েব মশায়ের চোখে যে দৃষ্টি দেখেছিলুম, তাতে মনে হ'ল ওখানে যদি ফিরে যাই তাহলে মাকে আবার নতুন করে বিপদে ফেলা হবে। ইতিমধ্যে পাড়ার চেনা একটি লোকের সঙ্গে দেখা হলো, সে যা খবর দিলে তাতে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। সে কয়েকদিন আগেই কলকাতা গিয়েছিল, বললে, সোহনলাল অপঘাতে মারা গেছে। মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে রাস্তার ধারে পড়েছিল, একটা মোটরলরি এসে তার মাথাটা চূরমার ক'রে দিয়ে চলে গেছে। শুনে যেন পাথর হয়ে গেলুম। চিরকালের মতো যদি পাথর হ'য়ে যেতুম তা হলেই ভালো হ'তো। কিন্তু তা হ'ল না। কপালে তখনও অনেক দুর্গতি লেখা ছিল। কি করি, কোথা যাই, মহা দুশ্চিন্তায় পড়লুম। আমাদের বাড়িতে যিনি নতুন ভাড়াটে এসেছিলেন, তাঁর স্ত্রী আমার দিকে একনজর চেয়ে তাঁর বাড়ীর বারান্দাতেও খানিকক্ষণের জন্যেও বসতে দিলেন না অথচ ওই বারান্দা একদিন আমারই ছিল। ওই বারান্দা কতবার ধুয়েছি, পুঁছেছি, নিকিয়েছি। এখন ওখানে আর আমার বসবার অধিকারও নেই। চামাররা অবশ্য খুব ভদ্র ব্যবহার করেছিল। বলেছিল, মাইজি তুমি যতদিন খুশী

আমাদের কাছে থাকো। কিন্তু চামারদের সঙ্গে থাকতে আমার প্রবৃত্তি হ'ল না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে লাগলাম, কোথাও যদি চাকরাণী হয়ে বাহাল হতে পারি এই আশায়। এমন সময় সেই বাড়িউলীর সঙ্গে আবার দেখা। সে খুব ভদ্র ব্যবহার করলে আমার সঙ্গে। তার কাছেই শুনলাম, রমজান আলীও নাকি মারা গেছে। যে দারোগাকে ও ষড়যন্ত্র করে' জেল দিয়েছিল, তারই পেয়ারের কোন গুণ্ডা নাকি ওকে খুন করেছে। সোহনলালের কথা শুনে ঝরঝর করে' কাঁদতে লাগল। বললে, ও রকম দিল-দরিয়া লোক দেখা যায় না। আমি ওকে না বলে' চলে' গিয়েছিলুম বলেই আমাকে বকতে লাগল খুব। তারপর বললে, 'তুমি যদি আমার কাছে থাকতে চাও, তোমাকে রাখতে পারি।' যদিও তোমাকে রেখে একবার খুবই হাঙ্গামায় পড়তে হয়েছিল আমাকে। আমি বললুম, আমাকে যদি ভদ্রভাবে রাখ, আমার উপর যদি জোর-জুলুম, জবরদস্তি না কর, তাহলে আমি থাকতে পারি। বাড়িউলী জিব কেটে বলল—'ছি, ছি, যা হয়ে গেছে তা আর কখনও হবে না। তাছাড়া অত বড় বড় 'অপ্‌সর' তোমার সহায়, আমি কি তোমার উপর আর জবরদস্তি করতে সাহস করি?' আমি ওই বাড়িউলীর কাছে থেকে গেলুম, দেখলুম ও ছাড়া আমার আর পথ নেই।

আপনি রাগ করবেন জানি। তবু আপনাকে বাবা বলে ডেকেছি, আপনার দয়াতেই কিছুদিনের জন্যেও সুখের সংসার পাততে পেরেছিলুম, একথা আমি কোন দিনই ভুলব না। তাই আবার আপনার সাহায্য ভিক্ষে করছি।

যা করছি তা আমার একটুও ভালো লাগে না। কিন্তু কি করব, বাধ্য হয়েই করছি। যদি আপনি দয়া করে' আমাকে অন্য কোথাও একটা কাজ জুটিয়ে দেন এখুনি চলে যাব। আপনাদের হাসপাতালে

শুনেছি, দাই, নার্স, এসব কাজ পাওয়া যায়। জুটিয়ে দিতে পারেন আমাকে একটা? কম মাইনে হলেও যাব। আমার নিজের সাদাসিধে খাওয়া পরার খরচটা চলে গেলেই হ'ল। আপনার কাছে সাহায্য চাইবার আমার আর মুখ নেই তা জানি, তবু চাইছি, কারণ সত্যিই আমি নিরুপায়। আর কি দয়া পাব আপনার? আমার শত কোটি প্রণাম জানবেন। ইতি

আপনার মেয়ে সরস্বতী

চিঠিখানা পড়ে' পণ্ডিতেরা যাকে "জুগুপ্সা" বলেন তাই জেগে উঠল আমার মনে। ঠিক করলুম, ওই কালভুজঙ্গিনীর সঙ্গে আর কোন সংশ্রব রাখব না। হাসপাতালের অ্যাপ্রেনটিস নার্স করে' ওকে বাহাল করে নিতে পারতুম কিন্তু ক্রোধান্ধ হয়েছিলুম, তাই ওর চিঠির উত্তর পর্যন্ত দিলাম না।

চিঠি পাওয়ার প্রায় বছর চারেক পরে আর একবার সরস্বতীর দেখা পেয়েছিলুম। তখন আমি আর এক জায়গায় বদলি হয়ে গেছি। দুপুর বেলা, একটা গাঁয়ে গেছি রোগী দেখতে। যাওয়ার সময় নজরে পড়েনি। ফেরবার সময় দেখলুম, গাঁয়ের বাইরে একটা ফাঁকা মাঠের মাঝখানে একটা গেরুয়া ধ্বজা উড়ছে। ধ্বজায় লাল অক্ষর দিয়ে লেখা—'সোহনলাল আশ্রম'। গাড়ী থামালুম। তারপর দেখতে পেলুম, অনেকগুলো ছেলে কাছেই ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। একটু দূরে ছোট্ট একটি মাটির ঘর, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা ঘরের পিছনে অনেক উঁচুতে কয়েকটা পায়রার টং। নানা জাতের পায়রাও চরে' বেড়াচ্ছে। নেবে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, মাটির ঘরের দাওয়ায় পাখীর খাঁচাও ঝুলছে কয়েকটা। একটা ময়না বলে উঠল, 'সোহনলাল,

সোহনলাল কী জয়'। যে ছোঁড়াগুলো ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল তাদের একজনকে ডেকে জিগ্যেস করলুম, এখানে কে থাকে। সে বললে, ভৈরবী মাইজি। এমন সময় সরস্বতী বেরিয়ে এল ঘর থেকে। মাথার চুল ছোট করে' ছাঁটা, পরনে গেরুয়া। যৌবনের সে উদগ্র-ভাব নেই, তার বদলে একটা শুদ্ধ শান্ত শ্রী বিকীর্ণ হচ্ছে তার সর্বাঙ্গ থেকে। আমাকে এখানে দেখতে পাবে তা সে প্রত্যাশা করেনি। অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলো। তারপর চিনতে পেরে একমুখ হেসে এগিয়ে এল আমার দিকে, প্রণামও করলো।

"বাবা! আপনি এখানে কি করে' এলেন?"

"কিছুদিন আগে বদলি হয়ে এসেছি। আমার তো জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়ানোই চাকরী। তুমি কি করে' এখানে এলে তাই বল—"

"আমি বাড়ি-উলীর কাছে কিছুদিন ছিলাম। যখন হাতে কিছু টাকা জমল তখন মনে হ'ল আর পাপের ভোগ করি কেন। একজনের কাছে খবর পেলুম, এখানে বেশ শস্তায় জমি পাওয়া যায়। খানিকটা জমি কিনে ছোট একটা ঘর বানিয়ে নিয়েছি এই-খানেই।"

"কি কর এখানে?"

"তিনি যা ভালোবাসতেন তাই করি। ছেলেদের ঘুড়ি কিনে দি, পায়রা আর পাখীর সেবা করি।"

নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কয়েক সেকেণ্ড।

তারপর জিগ্যেস করলুম—"তোমার ছেলে কোথায়?"

"সে তো মায়ের কাছে। এখন আর নেই।"

"এখন কোথা?"

"মারা গেছে ম্যালেরিয়ায় ভুগে।"

যে ছেলেগুলো ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল, তারা এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল আমাদের। তাদের দেখিয়ে সরস্বতী বললে—"এখন এরাই আমার ছেলে—"

হঠাৎ ইচ্ছে হ'ল ওকে একটা প্রণাম করি। কিন্তু ঝুঁকতে পারলুম না, টাইট প্যাণ্ট পরা ছিল। নিজের প্যাণ্ট নয়, ঝুটো আত্মসম্মানের প্যাণ্ট।

দেখ বৎস, তোমাকে যে এত বড় লম্বা চিঠি লিখলাম, তা তোমাকে গল্প শোনাবার জন্যে নয়। চিঠিটা লিখতে প্রায় পনেরো দিন লেগেছে। রাত জেগে জেগে লিখেছি। লিখেছি, কারণ তুমি আমার ছাত্র, শুধু তাই নয়, তুমি ডাক্তার হয়েছ অর্থাৎ তুমি সেই সম্প্রদায়ের একজন হয়েছ যারা বিদ্রোহী সভ্য মানবদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী বিদ্রোহী। প্রকৃতির নিয়ম অমান্য করেই মানুষ সভ্য হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতির যেটা সবচেয়ে কড়া নিয়ম, যা অনিবার্য, যা অমোঘ, ডাক্তাররা অস্ত্রধারণ করেছে তারই বিরুদ্ধে। তাদের লড়াই মৃত্যুর সঙ্গে, এই লড়াই করতে করতে ওরা নিজেরাও দলে দলে মরছে, কিন্তু তার পিছনে আসছে আবার একদল। বহুকাল থেকে এই চল্‌ছে, তুমিও এবার সেই দলে যোগ দিয়েছ। ডাক্তারদের বাজার দর আজকাল ক্রমশঃ কমছে, কিন্তু তাদের আসল দর কখনও কমবে না, যদি তারা অমানুষ না হয়। মানুষ অসুখে পড়বেই এবং সে আর্ত হ'য়ে তোমার কাছে আসবেই, তখন তুমি যদি তাদের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার কর তাহলে তুমি শুধু যে তাদের রোগ চিনতে পারবে, তা নয়, তাদেরও চিনতে পারবে। ডাক্তাররাই দেশের লোকদের স্বরূপ চিনতে পারে, আর্ত হ'লেই মানুষ তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে ফেলে। কাউকে যখন বাঘে ধরে তখন সে তার বগলের নীচে লুকানো দাদটাকে ঢাকবার চেষ্টা

করে না, যে তাকে বাঘের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে তার কাছে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হতেও তার আপত্তি নেই। সে যখন উলঙ্গ হ'য়ে তোমার কাছে আসবে তখন তার কদর্যতা দেখে নাক সিঁটকোনা, তাকে মরাল লেকচারও দিতে যেও না, শুধু একটি কথা মনে রেখ সে বিপন্ন মানুষ। ডারবিন আমাদের জীবনটাকে যুদ্ধ বলেছেন। সত্যিই আমরা জন্ম-মুহূর্ত থেকে মৃত্যু-মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রেই ঘোরাফেরা করি সবাই। এ যুদ্ধক্ষেত্রে চব্বিশ ঘণ্টাই গোলাগুলি চলছে, শুধু অসুখের জীবাণু নয়, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ-মাৎসর্য এই ছ'টা শত্রুর কারখানায় তৈরি নানা জাতের নানা আকারের গোলাগুলিও। ইন্দীবর নয়নের সলজ্জ কটাক্ষও আমাদের কম ঘায়েল করে না। আর একটি কথাও মনে রেখো, এই যুদ্ধক্ষেত্রে মাত্র দুই শ্রেণীর লোক দেখতে পাওয়া যায়, তাদের তোমরা ভালমন্দ, ধার্মিক-অধার্মিক, হিন্দু-অহিন্দু, বাঙালী-অবাঙালী এই কায়দায় ভাগ করতে অভ্যস্ত হয়েছো। কিন্তু তাদের ভাগ করা উচিত এইভাবে, (ক) যারা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়েছে, (খ) যারা এখনও হয়নি। এই সত্যদৃষ্টি দিয়ে যদি মানুষকে দেখতে অভ্যস্ত হও, তাহলে তাদের ঠিক স্বরূপটি দেখতে পাবে। আর তা না করে, যদি ঠিক করতে যাও ইনি মনুর বিধান মেনে চলেন কিনা, এঁর টিকি আছে কি নেই, মুরগী খান, না কুমড়ো খান, কার কাছে মন্ত্র নিয়েছেন, কংগ্রেসী না মুসলিম-লীগী, আর সেই অনুসারে তোমার মানস-থার্মোমিটারে সহানুভূতির পারা যদি ওঠা-নামা করতে থাকে, তা হলেই তোমার পতন হলো। তা হলেই তুমি আর বিজ্ঞানী ডাক্তার থাকলে না, চণ্ডীমণ্ডপের দা-ঠাকুর হ'য়ে গেলে।

তুমি পঞ্চকন্যার প্রসঙ্গ অবতারণা করেছিলে, সেই সুযোগে আমিও তোমাকে আমার দেখা পাঁচটি কন্যার কথা বললুম। আমার বক্তব্যটা আশা করি স্পষ্ট হয়েছে তোমার মনে। আমি

বলতে চেয়েছি, ওদের তোমরা যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছ, ওরা ঠিক তাই নয়। ওদের যদি শুধু অ্যানাটমি বা ফিজিওলজির ফরমুলায় ফেল, তোমার ক্ষুধা মেটাবার বা বংশবৃদ্ধি করবার যন্ত্র মাত্র মনে কর, তাহলে ওদের আসল পরিচয়ই পাবে না কখনও। ওরা যন্ত্ররূপেই ধরা দেবে তোমাদের কাছে, যেমন রোজ দিচ্ছে। কিন্তু ওদের সেই শক্তিকে তোমরা কখনও কাজে লাগাতে পারবে না যে শক্তি ওদের বৈশিষ্ট্য, আর যা কাজে লাগাতে পারলে দিগ্বিজয় করা যায়। ওদের সে শক্তিকে প্রত্যক্ষ করবার চোখ নেই তোমাদের। আমি জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দিয়ে তোমার সেই চোখ ফুটিয়ে দিতে চাই। তোমাদের একটা মহদ্দোষ কি জান? শুধু দোষ নয়, নির্বুদ্ধিতা। তোমরা ওদের প্রতি অনুকম্পা কর। মনে কর, আহা ওরা অতি দুর্বল, ওদের ব্রেনের ওজন কম, গায়ের জোর কম, তোমাদের কৃপাকণা না পেলে ওরা বাঁচবে না। তাই ওরা তোমাদের দাসী হয়ে আছে আর তোমরা দয়া করে' ওদের প্রভু হয়েছ। কিন্তু, ইউ ফুল্‌স্‌, তোমরা এটা বোঝনা যে প্রতি সংসারে ওরাই আসল কর্ত্রী। মা-রূপে, কন্যারূপে, বধূরূপে, প্রণয়িনীরূপে, নানা রূপে ওরা তোমাদের মত হাঁদাদের নাকে দড়ি পরিয়ে নাচাচ্ছে? তোমরা যখন হাম্বা-রব করে' গর্জন ছাড় "আমরা প্রভু", তখন ওরা মনে মনে হাসে, কারণ ওরা জানে যে আসলে ওরাই শক্তির আধার। তাই চুপ করে' থাকে, পূর্ণকুম্ভের মতো। ইচ্ছে করলে ওরা সতী-সাবিত্রীও হ'তে পারে, আবার ক্লিওপেট্রা ক্যাথারিনও হ'তে পারে। ঘর বাঁধতেও জানে, ঘর ভাঙতেও জানে। ঘোমটা টেনে রান্নাঘরের কোণে বসে তোমাকে সুক্তো বেগুন ভাজা খাইয়েও মুগ্ধ করতে পারে, আবার স্টেজে উঠে ওড়না উড়িয়ে, কোমর দুলিয়ে তোমার মুণ্ডুও ঘুরিয়ে দিতে পারে। সব পারে ওরা। চণ্ডী পড়েছ কখনও? যদি না পড়ে থাক

পোড়ো। দেখবে, সেখানে কবি নারীকে কি মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁরা জানতেন যে ইচ্ছে করলে ওই নারীশক্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকেও মোহগ্রস্ত করতে পারে।

যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।

সোঽপি নিদ্রা বশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ।

এই তামসী দেবীকে তাঁরা আরাধনা করেছিলেন, মধু ও কৈটভকে মোহগ্রস্ত করবার জন্যে। ওদের মোহগ্রস্ত না করতে পারলে বধ করা যেত না। চণ্ডীতে আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করবার মতো আছে। ওঁরা মহিষাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভর মতো জাঁদরেল দৈত্যদের মারবার জন্যে কোনও হোমরা-চোমরা পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করেন নি। করেছেন নারীকে। অম্বিকা শুম্ভ নিশুম্ভকেও মোহগ্রস্ত করেছিল। শুম্ভ নিশুম্ভের দূত যখন তাকে এসে বললে—আপনি স্ত্রী-রত্ন, শুম্ভ-নিশুম্ভও ত্রিলোকজয়ী বীর, আপনি তাঁদেরই ভজনা করুন। এর উত্তরে অম্বিকা শাড়ি গয়না চাননি, বলেছিলেন—

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি

যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি।

যিনি আমাকে যুদ্ধে হারিয়ে দিতে পারবেন, যিনি আমার দর্পচূর্ণ করবেন, যিনি জগতে আমার তুল্য বলশালী, তাঁকেই আমি পতিত্বে বরণ করব। যে দেশে নারীর এই রূপ কল্পনা করেছেন কবিরা, সেই দেশে তোমরা তাদের অবলা দুর্বলা বলে' অনুকম্পা কর? তোমাদের স্পর্ধা তো কম নয়। আই বেগ ইওর পার্ডন, এটা স্পর্ধা নয়, বোকামি। তোমরা ওদের চেননা, জাননা, জানবার চেষ্টাও কর না। চণ্ডী যদি পড় তাহলে আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করবে। যে বীর্যবতী মহিয়সী সিংহবাহিনী মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন, তাঁর জন্মকাহিনীটাও ভালো করে পড়ে দেখো। ব্রহ্মা-

বিষ্ণু-মহেশ্বরের তেজ এবং সমস্ত দেবকুলের তেজ একত্রিত হয়ে যে তেজোময়ী নারী সম্ভব হলেন, তাঁকে আরও প্রদীপ্ত করলেন সূর্য-চন্দ্র, দক্ষ প্রজাপতিরা, সমুজ্জ্বল করলেন সন্ধ্যা-দেবীগণ। বরুণ তাঁকে শঙ্খ দিলেন, অগ্নি শক্তি দিলেন, পবন দিলেন ধনুর্বাণ। ইন্দ্র নিজের বজ্র থেকে আর একটা বজ্র তৈরি করে দিলেন, ঐরাবত দিলেন ঘণ্টা, যম দিলেন কালদণ্ড। ক্ষীরোদ সমুদ্র তাঁকে সাজিয়ে দিলেন নানা অলঙ্কারে। তাঁর গলায় ঝুলিয়ে দিলেন উজ্জ্বল মুক্তাহার, কানে দিব্য কুণ্ডল, মাথায় পরিয়ে দিলেন চূড়ামণি, হস্তে বলয়, বাহুতে অঙ্গদ, পায়ে নুপূর, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়। সমুদ্র দিলেন তাঁকে অম্লান পদ্মের মালা, বিশ্বকর্মা তৈরি করে দিলেন কুঠার—হিমালয় দিলেন সিংহ, বাসুকী দিলেন নাগ-হার। অর্থাৎ ত্রিভুবনের সমস্ত পুরুষ-শক্তি একাগ্র হ'য়ে পুঞ্জীভূত হ'ল ওই তেজোসম্ভবা নারী-শক্তির মধ্যে। তাই তিনি আনন্দে অট্টহাস্য করে উঠলেন। 'সম্মানিতা, ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ। তাই তাঁর গর্জনে ত্রিভুবন কেঁপে উঠল। বুক্ষুভাঃ সকলা লোকাঃ, সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে। চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ। সপ্ত-সমুদ্র কেঁপে উঠল, পাহাড় বিচলিত হল। পুরুষদের তেজ, পুরুষদের আগ্রহ, পুরুষদের প্রতিভা—নারীশক্তির সঙ্গে মিললে তবেই মহিষাসুরকে বধ করা যায়। কোনও পুরুষ বীর মহিষাসুরের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি, কিন্তু যেই তাদের প্রতিভা, প্রেরণা, আগ্রহ নারীশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করল অমনি তা সম্ভব হয়ে গেল। এখনও আমাদের দেশে বহু মহিষাসুর, বহু শুম্ভ-নিশুম্ভ জন্মাচ্ছে, যুগে যুগে জন্মাবে, তাদের মারবার একমাত্র উপায় ওই চণ্ডীতে লেখা আছে। নারী-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, রিইনফোর্স করতে হবে, সেই নারী-শক্তির উৎস কোথায় সন্ধান করতে হবে, তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে, তবেই দুর্দান্ত মহিষাসুরদের বধ করা সম্ভব হবে। অন্য উপায় নৈব নৈব চ।

তুমি ডাক্তার। এই নারী-শক্তির নানা রূপ দেখবার সুযোগ তুমি পাবে। কখনও দেখবে বাল্ব, কখনও দেখবে মোটর, কখনও বা সরু তার শুধু। কিন্তু বিদ্যুতের কথাটা ভুলে যেও না। এটা সর্বদা মনে রেখ, কারেন্ট পেলেই ওরা সক্রিয় হয়ে ওঠে, এটম্ বম তৈরী করাও অসম্ভব নয় ওদের শক্তিতে। আর এটাও মনে রেখ মহিষাসুর বধ করতে হবে, আর তা তোমরা একা পারবে না, মেয়েদের শক্তির সাহায্য নিতে হবে।

মনের ভিতর অনেকদিন থেকে অনেক রকম গ্যাস জমেছিল, এই চিঠির সেফ্‌টি ভাল্‌ভ্ দিয়ে তার অনেকখানি বেরিয়ে গেল। আরাম বোধ করছি। থামবার আগে আবার বলছি, মনে রেখ মহিষাসুর বধ করতে হবে।

আশীর্বাদ জেনো, বিলেত যাচ্ছ নাকি? দেখো, বিলিতি বাঁদর হ'য়ে এসো না যেন। ইতি—শুভার্থী অগ্নীশ্বর।

৭

পাসপোর্ট না থাকা সত্ত্বেও কি করিয়া আমি লণ্ডনে পৌঁছিলাম, কি করিয়াই বা আমি সেখানকার পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করিলাম এ সবের বিশদ বিবরণ এ কাহিনীর পক্ষে অবান্তর। অবশ্য ইহা কল্পিত কাহিনী নহে, আমার জীবনেরই কাহিনী, কিন্তু কাহিনীর এই অংশটুকু আমার প্রাণদাতা ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি-তর্পণ। তাঁহার নিকট আমি যে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ, অক্ষম লেখনীতে তাঁহার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া সে ঋণ যে শোধ করা সম্ভব নয় তাহা আমি জানি, এ প্রয়াসও যে হাস্যকর সে বোধও আমার আছে, কিন্তু আমার দিক হইতে ইহার কৈফিয়ত, ইহা লিখিয়া আমি তৃপ্তি পাইতেছি।

পাসপোর্ট না থাকা সত্ত্বেও আমি লণ্ডনে পদার্পণ করিতে পারিয়াছিলাম সেই সারেং-এর সহায়তায়। আর সেই ডাক্তারবাবুটি যিনি এফ, আর, সি, এস পড়িতে যাইতেছিলেন, তাঁহার নিকটও আমি অসীম ঋণে ঋণী। তিনি আমাকে তাঁহার দাদার বাসায় লইয়া যান এবং বলেন, আমি দেশ হইতে এই গরীবের ছেলেটিকে লইয়া আসিয়াছি, ভালো রান্না করিতে পারে। যদি কোন সুযোগ পায় এখানে লেখাপড়া বা কোনও কাজকর্ম শিখিবে। আগেই বলিয়াছি তাঁহার দাদা একজন বড় পুলিশ অফিসার ছিলেন, বিখ্যাত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ট্রেনিং লইতেছিলেন। খাদ্যরসিক ব্যক্তি ছিলেন তিনি। আমি তাঁহাকে নানারকম দেশী তরকারি রাঁধিয়া খাওয়াইতে লাগিলাম। সুক্তো, শাকের ঘণ্ট, তিতার ডাল, মোচার ঘণ্ট প্রভৃতি লণ্ডনে দুষ্প্রাপ্য তরকারিগুলি খাইয়া তিনি খুবই খুশী হইয়া উঠিলেন। বস্তুত, উদর-পথে প্রবেশ করিয়াই আমি তাঁহার

হৃদয়ে স্থান লাভ করিলাম। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন সে স্থান হইতে আমি চ্যুত হই নাই। কিছুদিন থাকিবার পর তাঁহার নিকট আমি আমার মনোভাবটি প্রকাশ করিলাম। তিনি কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, আচ্ছা ব্যবস্থা করিয়া দিব। বিলাতে অনেক প্রাইভেট ডিটেকটিভ প্রতিষ্ঠান আছে। এই রকম একটি প্রতিষ্ঠানের কর্তার সহিত তাঁহার হৃদ্যতা ছিল। সেইখানেই তিনি আমাকে ঢুকাইয়া দিলেন। সেই প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতে করিতেই আমি আমেরিকা যাইবার সুযোগ পাই। এই প্রতিষ্ঠানের কর্তারও আমি প্রিয়পাত্র হইয়াছিলাম, তাঁহার সুপারিশে সেখানে একটি বৃহত্তর পুলিশ বিভাগে আমার একটি চাকরি জুটিয়া গেল। কিছুদিন চাকরি করিবার পর বাধিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। তখন যুদ্ধেই আমি গোয়েন্দা বিভাগে কাজ পাইয়া গেলাম। পৃথিবীর নানাস্থানে ঘুরিবার সুযোগ পাইলাম। কার্যে শুধু যে দক্ষতা অর্জন করিলাম তাহা নহে, বেশ সুনামও হইল। জঙ্গী বিভাগের বড় বড় অফিসাররা আমার কাজের প্রশংসা করিয়া সার্টিফিকেট দিলেন। এই যুদ্ধের সময়ই ভারতীয় বিপ্লবীদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য আমাকে ভারতবর্ষে বড় চাকরি দিয়া বদলি করা হইল। আমেরিকান সরকারের সুপারিশেই বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আমাকে এই চাকুরিটি দিলেন। আমি আসিয়া বিপ্লবীদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। সে সময় আমি কি কি করিয়াছিলাম তাহার পুঙ্খানু-পুঙ্খ বিবরণ দিব না।

বাংলাদেশে ফিরিয়াই আমি ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের খোঁজ করিয়াছিলাম। খোঁজ করিয়া যতটুকু খবর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম তাহা পূর্বেই লিখিয়াছি। তাঁহার শেষ খবর পাইয়া ছিলাম তিনি পুত্র-পুত্রবধূকে সংসারের সম্পূর্ণ ভার দিয়া কোনও হাসপাতালের ডাক্তার হইয়া গিয়াছেন। সেইখানেই নাকি আধুনিক

পদ্ধতিতে বাণপ্রস্থ-জীবনযাপন করিবেন। সেইখানেই গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিব ঠিক করিয়াছিলাম। কিন্তু ছুটি পাইতেছিলাম না বলিয়া হইয়া ওঠে নাই।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়া গেল।

আমরা অখণ্ড স্বাধীনতা চাহিয়াছিলাম, পাইলাম খণ্ডিত স্বাধীনতা। ঠিক তাহার পূর্বেই ডাইরেক্ট অ্যাকশনের উন্মত্ত তাণ্ডবে দেশের মাটি দেশের লোকের রক্তেই রঞ্জিত ও সিক্ত হইল। আমার পরিচয় ছিল মুসলমান, সুতরাং আমি পূর্ব-পাকিস্তানে নীত হইলাম। ইহাতে আমার দুঃখ হয় নাই। কারণ পূর্ব-পাকিস্তানকে আমি এখনও বাংলা দেশ বলিয়াই মনে করি। আমার প্রথম যৌবনের লীলা-ক্ষেত্র ওই পূর্ব-বঙ্গ, স্বাধীনতা মন্ত্রে ওইখানেই আমি দীক্ষা লইয়াছিলাম। অশ্বিনী দত্ত, পুলিন দাস, শান্তি দাস, প্রীতি ওয়াদ্দেদার, সূর্য সেন এবং আরো অসংখ্য বিখ্যাত-অখ্যাত আত্মত্যাগী বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গনাদের জন্মভূমি যে দেশ, সে দেশকে রাজনৈতিকরা যে নামেই অভিহিত করুন, আমার কাছে তাহা বাংলা দেশ। র‍্যাডক্লিফ দেশের মাটির উপর একটা লাইন টানিয়া দিলেই কি দেশের আত্মা বিভক্ত হইয়া যাইতে পারে? পারে না। পাকিস্তানে গিয়া আমার মনে হইয়াছিল মায়ের কোলেই ফিরিয়া আসিলাম।

কিন্তু ডাক্তার অগ্নীশ্বরের নিকট হইতে আমাকে অনেক দূরে চলিয়া যাইতে হইল। তাঁহার হাসপাতালের যে ঠিকানা পাইয়াছিলাম তাহা উত্তর প্রদেশের শেষ সীমান্তে। হিমালয়ের কাছাকাছি।

স্বাধীনতা পাইবার অনেকদিন পরে তাঁহার সন্ধানে বাহির হইবার সুযোগ হইল। সেখানে পৌঁছিয়া কিন্তু হতাশ হইলাম। শুনিলাম, বছর খানেক পূর্বে তিনি কাজে ইস্তফা দিয়া চলিয়া

গিয়াছেন। চলিয়া আসিবার কারণ যাহা শুনিলাম তাহাতে মনে হইল, অগ্নীশ্বরের উপযুক্ত কাজই হইয়াছে। একমাত্র অগ্নীশ্বরই ইহা পারেন।

হাসপাতালটি আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের নামের সহিত যুক্ত। নামটা আমি আর করিব না। সেখানে অগ্নীশ্বর সুখেই ছিলেন। কিন্তু একদিন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

তিনি একটি গরীব রোগীর অপারেশন করিবেন বলিয়া আগের দিন হইতে তাহাকে ঔষধ এনিমা প্রভৃতি দিয়া একটি আলাদা খালি ঘরে রাখিয়াছিলেন। পরদিন গিয়া দেখেন রোগী সেখানে নাই। জিজ্ঞাসা করিল—'এ কোথা গেল'। হাসপাতালের ছোট ডাক্তারবাবু বলিলেন, "মহারাজের আদেশে তাঁহাকে জেনারেল ওয়ার্ডে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।"

"কেন?"

"হাসপাতালের একজন বড় পেট্রন আসবেন। টেলিগ্রাম করেছেন, তাঁর জন্যে যেন একটা ঘর খালি রাখা হয়। অন্য ঘর ছিল না, তাই ওই রুগীটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে—"

অগ্নীশ্বর মহারাজের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যাপারটা সত্য কিনা, হাসপাতালের যিনি অধ্যক্ষ তাঁহাকে সকলে মহারাজ বলিয়া ডাকিত। মহারাজ বলিলেন, "কি করব বলুন, একে অতবড় লোক, তায় আমাদের একজন পেট্রন। তাঁর অনুরোধ এড়ানো শক্ত। যেখানে আপনার রুগীকে দিয়েছি সে বেডটাও ভালো, বেশ ফাঁকা—"

"ভালো কি মন্দ সেটা আমি ঠিক করব। যাক, আমার এখান থেকেও চাকরিটা গেল তাহলে। এতবড় মহাপুরুষের নামে

হাসপাতাল, এখানেও ধনী-দরিদ্রের ভেদ! এখানে আমার থাকা পোষাবে না। কালই আমি চলে যাব।"

মহারাজ তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "দেখুন, অপরের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে' আমাদের চলতে হয়, যাঁরা দাক্ষিণ্য দেখান তাঁরা কিছু সুবিধাও প্রত্যাশা করেন। সুতরাং আমরা নিরুপায়।"

অগ্নীশ্বর উত্তর দিয়াছিলেন, "তা বুঝতে পারছি। ওদেশে কিন্তু ওরা এমন নিরুপায় হয় না। আমেরিকার মেয়ো ব্রাদার্সের ক্লিনিকের ইতিহাস পড়ে দেখবেন। সেখানে আমেরিকার প্রেসিডেণ্টও যদি যান, তাঁর জন্মেও কোন পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয় না। তিনি চানও না—"

অগ্নীশ্বর সেখান হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু কোথায় যে গিয়াছেন তাহা কেহ বলিতে পারিল না। নিকটেই একটা শহরে একটা হোটেলে কিছুদিন ছিলেন শুনিলাম। সেখানে গিয়াও তাঁহাকে পাই নাই। অবশেষে তাঁহার ছেলের নিকট গিয়া হাজির হইলাম একদিন। ছেলে যাহা বলিল তাহা আরও বিস্ময়কর।

সে বলিল, "বছর চারেক বাবার কোনও খবর জানি না। তিনি তাঁর পেন্‌সন্ অর্ধেকটা অগ্রিম নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যে চিঠিটা সেই সঙ্গে লিখেছিলেন সেটা দেখাতে পারি আপনাকে, যদি দেখতে চান।

চিঠিতে লেখা ছিল—

কল্যাণবরেষু,

আমি আর তোমাদের কাছে ফিরব না। চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখলুম, তথাকথিত ভদ্রসমাজে কোথাও আমার স্থান নেই। কোথাও নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলুম না। হতচ্ছাড়া দেশকে গালাগালি দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আবার হঠাৎ আবিষ্কার

করেছি, এই দেশকেই ভালোবাসি এর শত দোষ সত্ত্বেও। এ দেশ ছেড়ে কোথা যাব। তাই ঠিক করেছি, তোমরা যাদের অপাংক্তেয় করে রেখেছ তাদের মধ্যে গিয়েই এবার থাকব। বিদ্যাসাগর মশাই শেষ জীবনে সাঁওতালদের মধ্যে এসে বাস করেছিলেন। তিনি নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন তোমাদের ভালো করতে গিয়ে, আমি নাস্তানাবুদ হয়েছি কিছু না করেই। তাই ঠিক করেছি, যে কটা দিন বাঁচি ভদ্রসমাজের আওতা থেকে দূরে থাকব। জানি না তুমি কোনও কালোবাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছ কিনা, যদি না হয়ে থাকো আশ্চর্য হব। কালোবাজারের আলকাতরা তো সকলের গায়েই লেগেছে। কালোবাজারের আঁস্তাকুড়ে যাদের কিলবিল করতে দেখি, তারা তো সবাই সাহেবী-পোশাক-পরা ভদ্রসন্তান। তাদের তোমরা বয়কট্ কর না, বরং সেলাম কর, কারণ তারা ধনী। গুণীদের নয়, ধনীদের পূজা করাই ভদ্রসমাজের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি দূর থেকে প্রণাম করে' সে সমাজ থেকে সরে পড়েছি।

আমাকে খোঁজবার চেষ্টা কোরো না। যে মহাসমুদ্রে এবার গা ভাসিয়ে দিতে চললুম, তার চেয়ে বড় সমুদ্র ভূগোলে নেই। এ সমুদ্রের ঢেউ দীন হীন আর্ত অসহায়েরা। এদের ত্রাণ করবার জন্যেই ভগবান নাকি মাঝে মাঝে মর্ত্যে অবতীর্ণ হন, তাঁরও খোঁজ করবার ইচ্ছে আছে।

আমার পেনসনের অর্ধেকটা 'কমিউট্' করে' দিয়ে গেলাম তোমাকে। আশীর্বাদ জেনো সকলে। ইতি—

শুভার্থী অগ্নীশ্বর

ইহার বেশী আর কিছুই জানিতে পারি নাই। আসিবার সময় তাঁহার ছেলের নিকট হইতে তাঁহার একটি ফোটো জোগাড় করিয়া

আনিয়াছিলাম। সেইটেই আমার শুইবার ঘরের একমাত্র ছবি সকালে উঠিয়া ছবি দেখি, আবার রাত্রেও সেই ছবি দেখিয়া শুইয়া পড়ি।

অগ্নীশ্বরের কাহিনী শেষ হইল। কিন্তু তিনি আমার কাছে আজও অশেষ। ঋগ্বেদের ঋষি বলিয়াছেন—অগ্নি পরমাত্মার সঙ্কেত, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা সে অগ্নির আহুতি। অগ্নি নিজে বলিয়াছেন, 'আমি দেব, যেখানে দেব-ভাব নাই সেখানে আমি থাকি না, যে যজ্ঞস্থল অপবিত্র সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমি শুষ্ক অরণীর মধ্যে আত্মগোপন করি। যে আমাকে প্রার্থনা করে, সেই আমাকে দেখিতে পায়। তাহার নিকটই আমি অমৃতরূপে প্রকাশিত হই। আমি শুধু পৃথিবীতেই নিবদ্ধ থাকি না, দ্যুলোকেও আমি নিয়ত গমন করি। সেখানে সূর্যই আমার সঙ্গী, তাঁহারই সহিত আমি পৃথিবীকে রূপ হইতে রূপান্তরে লইয়া যাই নানা ঋতুতে। আমি পবিত্র করি, অলঙ্কৃত করি এবং ধ্বংসও করি। যাহা নশ্বর তাহাকে দগ্ধ করিয়াই আমি বিকীর্ণ করি অবিনশ্বর জ্যোতি, যাহা অম্লান, নিষ্কলুষ, চিরদীপ্ত।"

ছবিটির দিকে চাহিয়া আমি অগ্নির এই ভাষা যেন শুনিতে পাই। যেন দেখিতে পাই, তিনি এক জ্যোতির্ময় অনন্ত পথে ঋজুপদবিক্ষেপে চলিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখে নিবদ্ধ, তাঁহার মস্তক আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহার রূপে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত।

আমি নির্বাক হইয়া চাহিয়া থাকি আর মনে মনে বলি,—

"হে অগ্নীশ্বর, তোমার নাম সার্থক, তোমার কর্ম সার্থক, তোমার জীবন সার্থক। তোমাকে আমি প্রণাম করি"

সত্য সত্যই তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া আছে, কিন্তু কোথায় তিনি? অনেক খুঁজিয়াছি, কিন্তু কোন সন্ধানই তো পাইলাম না। তিনি মারা গিয়াছেন একথা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা

হয় না। অতবড় একটা আগ্নেয়গিরি সে কি লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্ষুদ্র প্রদীপের মতো নিবিয়া যাইতে পারে? বিশ্বাস হয় না।

কিন্তু কোথায় তিনি?

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, পাকিস্তানে কিছুদিন থাকিবার পর আমি হিন্দুস্থানে চলিয়া আসিয়াছিলাম। এ কাহিনী বিহারে বসিয়া লিখিতেছি।

যে বেদের দল ধরা পড়িয়াছিল, জামিনে তাহাদের মুক্তি দেওয়া হয় নাই। যে দারোগা সাহেব তাহাদের ধরিয়াছিলেন, তিনি একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বলিলেন, "ওরা তো কিছুই কবুল করতে চাইছে না। সনাতন উপায় অবলম্বন করব কি?"

"কি উপায়—"

"মারধোর—"

"ওদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পেয়েছ কি?"

"না। হাতেনাতে তো ধরা যায়নি। সন্দেহের উপর ধরা হয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা, সম্প্রতি যে ক'টা খুন হয়েছে তা ওরাই করেছে।"

"এ ধারণা হ'ল কেন তোমার—"

"ওরা যেখানেই গেছে সেখানেই খুন হয়েছে। লালারাম, বিশ্বেশ্বর ঘোষ, রাঘব দালাল, জাফর আলী এদের প্রত্যেকের বাগান বাড়িতে ওই মেয়ে তিনটে নাচগানও করেছে—"

"ক'টা মেয়ে আছে?"

"তিনটে। মানে, তিনটেকে আমরা ধরেছি। কিন্তু শুনছি নাকি ওদের দল সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে। অদ্ভুত ওদের মোহিনী শক্তি, সার। জেলের ওয়ার্ডারগুলোকে সব বশ করে ফেলেছে। আমার মনে হয় বেশীদিন ওদের আটকে রাখা যাবে না,

জেল থেকে ঠিক ওরা পালাবে। ওই ওয়ার্ডাররাই ওদের ছেড়ে দেবে। আজ সকালে দেখি সেলের ভিতর একটা মেয়ে গান গাইছে, আর ওয়ার্ডারগুলো বাইরে বসে তাল দিচ্ছে। আমার মনে হয় সনাতন উপায় অবলম্বন না করলে ওদের কাছ থেকে কিছুই বার করা যাবে না—"

সনাতন উপায়ের নিদারুণ অভিজ্ঞতা আমার নিজেরই ছিল, সুতরাং আমি কোন কারণেই কোন কয়েদীর উপর শারীরিক অত্যাচার করিতে দিতাম না।

"না, মারধোর কোরো না। সেটা আইন নয়।"

"কিন্তু এমনিতে ওরা কিছু বলতে চায় না। মেয়ে তিনটি খালি মুচকি মুচকি হাসে, আর ওদের দলপতি খাখা-বাবা বলেন, আমি কিছু বলব না। আমার মনে হয় ওই লোকটাই সমস্ত অর্গানিজেশনের ব্রেন। মেয়ে তিনটে প্রায়ই যেতো ওঁর কাছে।"

"খাখা-বাবা থাকেন কোথা ? মুঙ্গেরেই ?"

"না, মুঙ্গেরে আমরা ওঁকে ধরেছি, কিন্তু উনি মাত্র সাতদিন আগে সেখানে এসেছেন। মেয়ে তিনটেও ওঁর বাড়িতেই ছিল। তারা বলে, উনি নাকি ওষুধ দেন। যাই হোক, আমরা সবাইকে ধরে এনেছি। প্রমাণ কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু আমার বিশ্বাস এই চারটে খুনের মূলেই ওরা আছে।"

"আচ্ছা, ওদের সঙ্গে আমিই কথা কইব। এইখানেই নিয়ে এস।"

একটু পরেই দারোগা আসিয়া খবর দিলেন—"ওদের এনেছি। পাশের ঘরে বসাব ?"

"বসাও"

আমি বিবাহ করি নাই, প্রকাণ্ড কোয়ার্টারে একাই থাকিতাম। ঘরের অভাব ছিল না। আমার আপিসও আমার কোয়ার্টারেরই একধারে ছিল।

একটা লোডেড্ রিভলভার পকেটে পুরিয়া পাশের ঘরে গেলাম। গিয়া কিন্তু চমকাইয়া উঠিলাম। খা-খা বাবা? এ যে ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়! মেয়ে তিনটিও অপরূপ, যেন তিনটি অপ্সরা। নির্নিমেষে খা-খা বাবার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। না, আমার ভুল হয় নাই। এ ছবি যে রোজ দেখি।

দারোগা সাহেবকে বলিলাম, "আমি একে একে এদের সঙ্গে কথা বলব। মেয়ে তিনজনকে অন্য ঘরে বসাও। তুমিও ওদের কাছেই থাক গিয়ে, এখানে কাউকে থাকতে হবে না।"

সকলে চলিয়া গেলে প্রশ্ন করিলাম, "আমাকে চিনতে পারছেন?"

খা-খা বাবা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "কই না, আপনাকে কখনও দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"আমি কিন্তু আপনাকে চিনেছি। আপনি খা-খা বাবা নন্, আপনি ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়।"

তাঁহার মুখে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, "না, আপনার ভুল হয়েছে! চেহারার সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব নয়। আমি অগ্নীশ্বর নই, আমি খা-খা বাবা।"

"এ রকম অদ্ভুত নাম নিয়েছেন কেন?"

"যে নাম নিয়েছি, সে নামের উপযুক্ত আমি নই। কিন্তু আপনারা রোগা ভীতু ছেলের নামও তো বীরেন্দ্র বা রুস্তম্ রাখেন। এইটেই রেওয়াজ এদেশে। যার অন্তরে বাইরে ময়লা ঠাসা তার নাম নির্মল, বিমল বা অমল। দিগ্বিজয়ী বীর চেংগীস্ খাঁর নাম

ছিল খাঁ-খাঁ খাঁ। আমার বাবা বোধহয় ভেবেছিলেন, আমি দিগ্বিজয়ী বীর হব তাই ও-নাম রেখেছিলেন।”

“আপনারা কি মুসলমান ?”

“না, আমি ব্রাহ্মণ। ও খাঁ শুনে মুসলমান ভাবছেন বুঝি ? চেংগীস্ খাঁও মুসলমান ছিলেন না। সেকালে যাযাবর নোম্যাড্‌দের যাঁরা দলপতি হতেন তাঁদের উপাধি হতো খাঁ। কিম্বা খান্। চেংগীস্ খাঁ নামটাও আসলে নাকি ঘেগিংস খাঁ—”

কথা শুনিয়া আমার আর সন্দেহ রহিল না। এ রকম কথা অগ্নীশ্বর ছাড়া আর কেহ বলিতে পারেন না।

বলিলাম, “চেহারার সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব নয় তা জানি। কিন্তু অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়কে চিনতে পারব না, এতবড় ভুল আমার হতে পারে না।”

“আপনার এতবড় আত্মপ্রত্যয়ের হেতুটা কি—”

“তিনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর ছবি আমার শোবার ঘরে টাঙানো আছে।”

“প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন ? কি রকম ?”

“সব বলছি। আপনি অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায় এ বিশ্বাস যদি আমার দৃঢ় না হতো তাহলে যা বলতে যাচ্ছি তা আপনাকে বলতাম না। কারণ একথা জানাজানি হলে আমার চাকরি যেতে পারে। দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে, তবু যেতে পারে। কারণ আমি যা করেছি তা প্রতারণা।”

অগ্নীশ্বর চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে একটা কৌতূহল ফুটিয়া উঠিল। আমি তখন তাঁহাকে অকপটে সব খুলিয়া বলিলাম। শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে তাঁহার চোখের পাতায় কম্পন জাগিল, মুখে মৃদু হাসিও ফুটিল। কিন্তু সব শুনিবার

পরও তিনি বলিলেন, "আপনি যার কথা বলছেন, আমি সে লোক নই।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তখন তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম—"আচ্ছা, আপনার আসল পরিচয় তাহলে জানতে পারি কি? আপনি কি করেন, কোথায় থাকেন, এই দলে কি করে এলেন, পুলিশ আপনার বিরুদ্ধে যে সব চার্জ এনেছে সে সম্বন্ধে আপনার কিছু বলবার আছে কি না—"

"আমি আমার সম্বন্ধে কিছুই বলব না। সত্য আপনিই বেরিয়ে পড়বে। এইটুকু বলতে পারি, যে মেয়ে তিনটিকে ধরে এনেছেন তারা আমার কন্যাস্থানীয়া।"

"ওদের নিয়ে আপনি বেদের দল গড়েছেন?"

"ধরুন গড়েছি। তাতেই বা ক্ষতি কি?"

"আপনার মতো লোক বেদের দল গড়েছেন একথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না।"

"কেন, বেদেরা কি হেয়? ওরাই তো সব চেয়ে বেশী স্বাধীন। ওদের কোন বন্ধন নেই। বন্ধনের যে দু'টো প্রধান শিকল 'কর্তব্য' আর 'সম্পত্তি' সে দুটো কথাই নেই ওদের অভিধানে। ওদের সঙ্গে যদি যোগ দিয়ে থাকি অন্যায়টা কি হয়েছে তাতে?"

"আপনাদের চলে কি করে?

"ওই মেয়ে তিনটি নেচে গেয়ে অনেক টাকা রোজগার করে। ওদের গান শুনবেন?"

"না। কিন্তু আপনি যা বলছেন তা মনে নিচ্ছে না। আপনি যে ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুকুজ্যে এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আপনি যদি বেদের দল গড়েও থাকেন তাহলে তার পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। হয়তো সেটা ন্যায়সঙ্গত নয়। আপনি আমাকেও অন্যায়ভাবেই ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার পিছনে একটা

দেশভক্তির প্রেরণা ছিল। এর পিছনেও নিশ্চয়ই কিছু আছে একটা। সেইটে কি আমি জানতে চাই। বিশ্বাস করুন, আমার দ্বারা আপনার কোন অনিষ্ট হবে না। কিন্তু সত্যকথাটা আমি শুনতে চাই। যে অগ্নীশ্বরকে আমি মনের মন্দিরে দেবতার মতো সাজিয়ে রেখেছি তাকে এমনভাবে বিসর্জন দিতে পারব না।"

অগ্নীশ্বরের ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত হইল।

"দেবতার মতো সাজিয়ে রেখেছেন ? সত্যি ?"

"সত্যি। আপনার সত্য পরিচয়টা দিন।"

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া অগ্নীশ্বর বলিলেন—"একটা জিনিস যদি লক্ষ্য করে' দেখেন, তা হ'লে হয়তো সত্যের কিছু আভাস পেতে পারবেন। যে চারটে লোক খুন হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই দেশের শত্রু, প্রত্যেকেই ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার। লক্ষ লক্ষ গরীব লোককে বঞ্চিত করে' লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছে ওরা—"

"তাহলে কি—"

"হ্যাঁ, মনে করুন না তাই। আমি বাঙালী, বিদ্রোহ আমার মজ্জাগত। মনে করুন, দেশের শত্রু নিপাতের আমি অভিনব পন্থা বার করেছি। ধরুন আমার মনে হয়েছে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে বাঙালী একদিন ইংরেজের সঙ্গে লড়েছিল এইবার তার দুর্নীতির সঙ্গে লড়া উচিত। যদি দরকার হয় তার জন্য প্রাণ দিক—"

তাহার পর কিছুক্ষণ থামিয়া বলিলেন, "আমি আমার শেষ জীবনে দেশকে শত্রুমুক্ত করবার এই উপায় অবলম্বন করেছি এই ভেবে যদি আপনি তৃপ্তি পান, তাহলে তাই ভাবুন—"

"আমরাও তো আইনের সাহায্যে ওই কাজই করছি। দুর্নীতি দমন আমাদের একটা প্রধান কাজ—"

"তা জানি। কিন্তু এটাও তো মিছে কথা নয় যে, সবাই আপনাদের জালে ধরা পড়ছে না। শুম্ভ-নিশুম্ভ, মহিষাসুর এরাও

সাধারণ আইনের জালে ধরা পড়ে নি। তাদের ধ্বংস করবার জন্যে অম্বিকা চণ্ডীর দরকার হয়েছিল। মনে করুন, আধুনিক উপায়ে আমি তাই করছি। ওই বেদের মেয়েদের মধ্যেই অম্বিকা আর চণ্ডীর রূপ প্রত্যক্ষ করেছি আমি—"

"কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণ, এই সব নৃশংস ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া কি আপনার সাজে ?"

"ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে আপনার পুরো ধারণা নেই তাহলে। নৃশংসতার ভয়ে ব্রাহ্মণেরা কোন কালে অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে পিছ্‌পা হয় নি। পরশুরামকে কুঠার ধারণ করতে হয়েছিল, চাণক্যকে ষড়যন্ত্র করতে হয়েছিল নন্দবংশ ধ্বংস করবার জন্যে। এদেশে ব্রাহ্মণদের অধঃপতন হয়েছে বলেই এত দুর্দশা চতুর্দিকে। মনু পতিত ব্রাহ্মণদের অপাংক্তেয় করেছিলেন কিন্তু এরাই আজ আসর জাঁকিয়ে বসেছে সব জায়গায়। ধরুন, যদি আমি ভেবে থাকি যে আমাদের স্বাধীনতাকে অম্লান অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে এদের সরাতে হবে, তা করতে গিয়ে যদি দু'একটা ভালো লোকও মারা পড়ে তাতেও ক্ষতি নেই, ফ্রেঞ্চ রিভল্যুশনের সময় ওরা রোব্‌সপেয়ার ড্যানটনের মতো লোককেও বলি দিয়েছিল"

হঠাৎ অগ্নীশ্বর চুপ করিয়া গেলেন।

বলিলাম, "বলুন, শুন্‌তে খুব ভালো লাগছে। বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে ছেড়ে দেব—"

"দেখুন, জীবনে কখনও কারো কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিনি। আপনার কাছেও করছি না। আমাকে জেলে পুরে রাখলে বা ফাঁসি দিলে যদি আপনার চাকরির সুবিধা হয় তাহলে তাই করুন। ওই বেদের মেয়েদের সঙ্গে আমি নরকে যেতেও রাজি আছি। ওরা নরককেও স্বর্গ করে তুলবে। জিপ্‌সিদের ইতিহাস পড়েছেন? অনেকে বলেন, ওদের আদি নিবাস ছিল ভারতবর্ষ। আমার মনে

হয়, ওরাই রামায়ণ মহাভারতের গন্ধর্ব। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট ওদের নিয়ে গিয়েছিলেন গ্রীসে। সেখান থেকে ওরা সারা ইয়োরোপে আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতি দেশে ওদের উপর যে অসহ্য অত্যাচার হয়েছে তা অবর্ণনীয়। কিন্তু তবু ওরা [illegible] টিকে আছে এখনও। শুধু টিকে নেই, নেচে গেয়ে মাত করে রেখেছে প্রত্যেক দেশকে। ওদের রঙ, ওদের রূপ, ওদের শিল্প, ওদের সঙ্গীতনৈপুণ্য আজও অলঙ্কার হয়ে আছে প্রত্যেক দেশের এই অবহেলিত অবজ্ঞাত কিন্তু দুর্জয়-প্রাণরসে-ভরপুর [illegible] দলে যদি ভিড়েই থাকি তাহলে ক্ষতি কি—”

আমার মনে হইল, আসল অগ্নীশ্বরকে এইবার [illegible] করিলাম। দেখিলাম তাঁহার চোখের দৃষ্টি হাসিতে ঝলমল করিতেছে। অনেক দিন হইতেই তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিবার ইচ্ছা ছিল। উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, “আমার ভুল ভেঙেছে। আপনার কথায় অবিশ্বাস করেছিলুম বলে’ আমাকে ক্ষমা করুন।”

সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন তিনি।

“একটা বক্তৃতার ধাক্কায় সব বদলে গেল! হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল অতবড় যুক্তির ইমারত? সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস হল যে, আমি ওই বেদের মেয়েগুলোর সাহায্যে লোক খুন করে বেড়াচ্ছি? উঃ, বক্তৃতার উপর কি ভক্তি, কি ভক্তি। একেবারে গদগদ হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে ফেললেন! হা হা হা হা—”

তাঁহার অট্টহাস্যে সমস্ত বাড়িটা যেন কাঁপিতে লাগিল। দারোগা সাহেব পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিলেন। আমি তাঁহাকে ইঙ্গিতে চলিয়া যাইতে বলিলাম। সত্যই আমি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বলিলাম, “আপনার কথায় অবিশ্বাস করিবার শক্তি আমার নেই। আপনার সত্য পরিচয়টা দিন—”

"কি হবে সত্য পরিচয় জেনে? পৃথিবীতে ক'টা জিনিসের সত্য পরিচয় জানেন?"

"না, তবু বলুন।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কিছুতেই যখন ছাড়বেন না, তখন শুনুন। আমি মশাই ডাক্তার। মানুষকে বাঁচানোই আমার কাজ, মারা নয়। দুরাত্মা, মহাত্মা, সতী-অসতী যে কেউ আমার কাছে অসুস্থ হয়ে আসবে তাকেই আমি সুস্থ করতে চেষ্টা করব। নেপোলিয়নের সেই গল্পটা মনে আছে? একবার এক যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ন খুব বিব্রত হয়েছিলেন কতকগুলি মুমূর্ষু সৈন্য নিয়ে। তাদের খেতে দিতে হচ্ছে, অথচ তারা কোন কাজে লাগছে না। তখন তিনি আর্মি ডাক্তারকে ডেকে বললেন—'ওদের তুমি মেরে ফেল। কি লাভ ওদের বাঁচিয়ে রেখে।' ডাক্তার উত্তর দিয়েছিলেন—'আমার কাজ বাঁচানো, মারা নয়। আপনার হাতে অস্ত্র আছে, নিধন করাই আপনার কাজ। আপনিই মেরে ফেলুন না ওদের। আমি পারব না।' আমি সেই ডাক্তারের সগোত্র। এই হতভাগা দেশের রুগ্ন, খিটখিটে, বদমাইস, বেকারগুলোকে বাঁচিয়ে লাভ নেই জানি, কিন্তু তবু ওদের বাঁচাবারই চেষ্টা করি। ও ছাড়া আর কিছু পারি না, জানি না। ওই জিপ্‌সি মেয়েগুলো আমার রুগী। আমার খগেশ্বর নাম ওদের মুখ দিয়ে বেরোয় না বলে ওরা আমাকে খাগা-বাবা বলতো। সেটা ক্রমশ খা-খা-বাবা হয়েছে। নামটার একটা ঐতিহাসিক মহিমা আছে বলে ও নাম আমি ত্যাগ করিনি। আমি এক জায়গায় থাকি না, নানা শহরে ঘুরে বেড়াই। ওই জিপ্‌সিগুলো কিন্তু আমার সঙ্গ ছাড়ে না। যেখানেই যাই খুঁজে বার করে আমাকে। ওদের নিজের চিকিৎসা ওরা নিজেরাই প্রায় করে নিজেদের ওষুধ দিয়ে। হালে পানি না

পেলে আমার কাছে যাওয়া আসা করে বলে আপনার বুদ্ধিমান অফিসারটি আমাকেও ওদের সঙ্গে জড়িয়েছেন। ভক্তিটা হঠাৎ কমে গেল, নয়? চললুম গুড্‌বাই।”

পরে সত্যই প্রমাণিত হইয়াছিল যে, খগেশ্বর মুখোপাধ্যায় ডাক্তারিই করেন। গরীবের ডাক্তার তিনি। দীন দরিদ্র অসহায় যাহারা, তাহাদেরই তিনি চিকিৎসা করেন। যে যাহা দেয় তাহাই গ্রহণ করেন। মহত্ত্ব আস্ফালন করিয়া কাহারও ফি ফেরৎ দেন না, জোর করিয়া কাহারও নিকট হইতে কিছু আদায়ও করেন না। সত্যই এক শহরে বেশী দিন থাকেন না। এক মাসের বেশী কোথাও না। সারা দেশময় তিনি ঘুরিয়া বেড়ান। একবেলা খান, স্বপাক। পরনে শাদা থান, লংক্লথের পাঞ্জাবি, পায়ে চটি

যে ভদ্রসমাজ হইতে তিনি চলিয়া গিয়াছেন, সেই ভদ্রসমাজ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই সম্ভবত তিনি খগেশ্বর নামের আড়ালে অজ্ঞাতবাস করিতেছেন।

এ অজ্ঞাতবাস হইতে তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করি নাই। কারণ, বুঝিয়াছি ইহাতে তিনি কষ্ট পাইবেন

কিন্তু আমি নিঃসংশয়ে [illegible]

তিনি যেখানে যে নামেই থাকুন না কেন, তিনি পাবক তিনি পবিত্র, তিনি উজ্জ্বল।

তাঁহাকে বারম্বার প্রণাম করি।